আমরা সেই সে জাতি

আবুল আসাদ

আমরা সেই সে জাতি

[প্রথম খণ্ড]

আবুল আসাদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-31-0932-5 (set)

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯২

১৬তম প্রকাশ যুলহিজ্জা ১৪৩৪
কার্তিক ১৪২০
অকটোবর ২০১৩

মুদ্রণ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় ষাট টাকা মাত্র

Amra Shei She Jati Vol-1 **Written by Abul Asad and Published by AKM Nazir** Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition March 1992 Sixteenth Edition October 2013 Price Taka 60.00 only

সূচিপত্র

খাব্বাবের আকাংখা

একদম প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, খাব্বাব তাঁদের একজন। বোধ হয় ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় জনের পরই তাঁর স্থান হবে। তিনি একজন মহিলার কৃতদাস ছিলেন। মহিলাটি ছিল নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। যখন সে জানতে পারলো খাব্বাব ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার শুরু হলো। অধিকাংশ সময় তাঁকে নগ্ন দেহে তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রাখা হতো। যার ফলে তাঁর কোমরের গোশত গলে পড়ে গিয়েছিলো। ঐ নিষ্ঠুর রমনী মাঝে মাঝে লোহা গরম করে তাঁর মাথায় দাগ দিত।

অনেকদিন পর হযরত উমারের রাজত্বকালে হযরত উমার একদিন তাঁর উপর নির্যাতনের বিস্তৃত জানতে চাইলেন। খাব্বাব তখন বললেন, "আমার কোমর দেখুন।" হযরত উমার কোমর দেখে আঁৎকে উঠে বললেন, "এমন কোমর তো কোথাও দেখিনি।" উত্তরে খাব্বাব খলিফাকে জানালেন, "আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে চেপে ধরে রাখা হতো, ফলে আমার চর্বি ও রক্তে আগুন নিভে যেত।"

এই নির্মম শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও ইসলামের যখন শক্তি বৃদ্ধি হল এবং মুসলিমদের বিজয় সূচিত হলো, তখন খাব্বাব রোদন করে বলতেন, "খোদা না করুন আমার কষ্টের পুরস্কার দুনিয়াতেই যেন লাভ না হয়।"

মাত্র ৩৬ বছর বয়সে হযরত খাব্বাবের মৃত্যু হয় এবং সাহাবাদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনিই কুবায় কবরস্থ হন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা) তাঁর একদিন তাঁর কবরের পাশদিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, "আল্লাহ খাব্বাবের উপর রহম করুন। তিনি নিজের খুশিতেই মুসলিম হয়েছিলেন। নিজ খুশিতেই হিজরাত করেছিলেন। তিনি সমস্ত জীবন জিহাদে কাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।"

'তাওহীদের মহাবাণী গোপন রাখতে পারবো না'

হযরত আবুযার আরবের গিফার গোত্রের লোক। মক্কা থেকে অনেক দূরে বাস করেন তিনি। সত্যানুসন্ধি আবুযার শুনলেন মক্কায় একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন। আবুযার মক্কায় গিয়ে তাঁর সাক্ষাত লাভের মনস্থ করলেন। কিন্তু কুরাইশদের শ্যেন দৃষ্টির সামনে তাঁকে খুঁজে বের করে সাক্ষাত করা নিরাপদ নয়। তবু আবুযার মক্কায় চললেন। সত্যসন্ধানী আবুযারকে সত্য প্রচারকের সাক্ষাত যে পেতেই হবে। মক্কায় গিয়ে তিনদিন মৌন অনুসন্ধানের পর আবুযার মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। নবীর সাক্ষাত পেয়েই সত্যের জন্য পাগল পারা আবুযার ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবুযারকে উপদেশ দিলেন, "ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখে তুমি নীরবে দেশে ফিরে যাও।"

ইসলাম গ্রহণ করে আবুযার কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলেন না। যে সত্য গ্রহণের জন্য এতদিন তিনি পাগল প্রায় ছিলেন, সে সত্য প্রচারের জন্য এখন তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো। ফুল শয্যায় শয়ন করে কাল কাটাবার জন্য আবুযার ইসলাম গ্রহণ করেন নি কিংবা নিরাপদে মুসলিম হয়ে থাকার বাহবাও তো আবুযারের জন্য নয়। তাহলে আবুযার চুপ করে থাকবে কেন? এই চিন্তা আবুযারকে চুপ থাকতে দিল না,

স্থির হতে দিল না। হযরত আবুযার বিনীতভাবে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নিবেদন করলেন, "তাওহীদের মহাবাণী আমি গোপন রাখতে পারবো না, কাফিরদের মধ্যে গিয়ে চেঁচিয়ে তা ঘোষণা করবো।"

যে আবুযার কাফিরদের ভয়ে মক্কায় মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম পর্যন্ত নিতে সাহস করেন নি, সকলের চোখ এড়িয়ে গোপনে তিনদিন ধরে যে আবুযার মহানবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুঁজে ফিরেছেন কালেমা তাওহীদ উচ্চারণের পর সেই আবুযার সমস্ত ভয়-ভীতি, অত্যাচার এমন কি মৃত্যু ভয়ের আশঙ্কাকেও জয় করে নিলেন। কিছুই আর তাঁকে পিছনে টানতে পারলো না। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে হযরত আবুযার ছুটে এলেন কাবার চত্বরে। সেখানে অনেক কুরাইশ জটলা পাকিয়ে বসেছিলো। আবুযার কাবা গৃহের সামনে গিয়ে বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করলেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল।

হযরত আবুযারের তাওহীদি ঘোষণা বোধ হয় কুরাইশদের হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হয়েছিলো। তারা আহত হিংস্র পশুর মত ছুটে এলো আবুযারকে লক্ষ্য করে। সবাই মিলে চারদিক থেকে নির্মম প্রহার শুরু করলো তাঁর উপর। আঘাতে আঘাতে আবুযারের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল কাপড়-চোপড়। ঢলে পড়লেন মাটিতে। তিনি মুমূর্ষ।

সেখানে হযরত আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনও মুসলিম না হলেও ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি মুমূর্ষ আবুযারের দেহকে নিজের দেহ

দিয়ে আড়াল করে উন্মাদ প্রায় কুরাইশদের বলতে লাগলেন, "কি সর্বনাশ! এ যে গিফার গোত্রের লোক। সিরিয়া যাবার পথেই এদের নিবাস। এর এভাবে মৃত্যু হলে সিরিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য করার পথই যে আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে।" একথা শুনে কুরাইশদের সম্বিত ফিরে এলো। তাদের মনে হলো, আব্বাস তো ঠিক কথাই বলেছেন। তারা আবুযারকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

এ অমানুষিক নিপীড়ন হযরত আবুযারকে সত্যের প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারে নি। এই ঘটনার পরও তিনি পর পর দু'দিন কাবার চত্বরে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাওহীদের বাণী ঘোষণা করেছেন। অত্যাচার-নিপীড়নেরও পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু আবুযার সত্যের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সব কিছুকেই মেনে নিয়েছেন হাসি মুখে। অদ্ভুত শক্তি তাওহীদের। মনে-প্রাণে একবার এ কলেমা পাঠ করলে মানুষের মনে যে শক্তির বন্যা আসে, তার সামনে থেকে জগতের সব অত্যাচার, সব যুল্‌ম আর তার ভয় তৃণ খণ্ডের মতো ভেসে যায়।

‘আমি ঠকিনি বন্ধু’

মক্কার ধনী উমাইয়া। ধনে-মানে সব দিক দিয়েই কুরাইশদের একজন প্রধান ব্যক্তি সে। প্রাচুর্যের যেমন তার শেষ নেই, ইসলাম বিদ্বেষেও তার কোন জুড়ি নেই। শিশু ইসলামকে ধ্বংসের কোন চেষ্টারই সে ত্রুটি করে না। এই ঘোরতর ইসলাম বৈরী উমাইয়ারই একজন ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করেছে। তা জানতে পারলো উমাইয়া। জানতে পেরে ক্রোধে ফেটে পড়লো সে। অকথ্য নির্যাতন সে শুরু করলো। প্রহারে জর্জরিত সংজ্ঞাহীন-প্রায় কৃতদাসকে সে নির্দেষ দেয়, “এখনও বলি, মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ কর। নতুবা তোর রক্ষা নেই।”

কিন্তু তার ক্রীতদাস বিশ্বাসে অটল। শত নির্যাতন করেও তার বিশ্বাসে বিন্দু মাত্র ফাটল ধরানো গেল না। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে পড়লো উমাইয়া। শাস্তির আরো কঠোরতর পথ অনুসরণ করল সে।

একদিনের ঘটনা। আরব মরুভূমির মধ্যাহ্ন। আগুনের মত রোদ নামছে আকাশ থেকে। মরুভূমির বালু যেন টগবগিয়ে ফুটছে। উমাইয়া তার ক্রীতদাসকে নির্দয়ভাবে প্রহার করলো। তারপর তাঁকে সূর্যমুখী করে শুইয়ে দেয়া হলো। ভারি পাথর চাপিয়ে দেয়া হলো বুকে। কৃতদাসের মুখে কোন অনুনয়-বিনয় নেই। মনে নেই কোন শংকা। চোখে অশ্রু নেই, মুখে কোন আর্তনাদও নেই। উর্ধ্বমুখী তাঁর প্রসন্ন মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনি– ‘আহাদ’, ‘আহাদ’।

ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ তাঁর কানে গেল। অনুসন্ধিৎসু হয়ে শব্দ লক্ষ্যে তিনি মরুভূমির বুকে শায়িত ক্রীতদাসের সমীপবর্তী হলেন। উমাইয়াকে দেখে তিনি সব ব্যাপারটাই মনে মনে বুঝে নিলেন। বললেন, "উমাইয়া, আপনাকে তো ধনী ও বিবেচক লোক বলেই জানতাম। কিন্তু আজ প্রমাণ পেলাম, আমার ধারণা ঠিক নয়। দাসটি যদি এতই না পসন্দ, তাকে বিক্রি করে দিলেই পারেন। এমন নির্দয় আচরণ কি মানুষের কাজ।"

হযরত আবু বকরের ঔষধে কাজ হলো। উমাইয়া বললেন, "এত বাহাদুরী দেখাবেন না। দাস আমার এর উপর সদাচার- কদাচার করবার অধিকার আমারই। তা যদি এতই দয়া লেগে থাকে, তবে একে কিনে নিলেই পারেন।"

হযরত আবু বকর (রা) এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি চট করে রাজী হয়ে গেলেন। একজন শ্বেতাংগ ক্রীতদাস ও দশটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে কিনে নিলেন কৃষ্ণাংগ ক্রীতদাসকে। হযরত আবু বকর (রা) ক্রীতদাসকে মরুভূমির বুক থেকে টেনে তুলে গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলেন। উমাইয়া বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, "কেমন বোকা তুমি বলত? এ অকর্মন্য ভৃত্যটাকে একটি সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়েই বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলাম। এখন আমার লাভ ও তোমার ক্ষতি দেখে হাসি সম্বরণ করতে পারছিনা।"

আবু বকরও (রা) হেসে বললেন, "আমি ঠকিনি বন্ধু! এ ক্রীতদাসকে কেনার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি দিতে হলেও আমি কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু একে আমি ধারণাতীত সস্তা মূল্যে ক্রয় করে নিয়ে চললাম।"

এ দাসটিই ছিলেন বিশ্ব বিশ্রুত বিলাল। ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রা)।

উমার হলেন আল ফারুক

হযরত উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেই জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, বর্তমানে মুসলিমের সংখ্যা কত?" মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, "তোমাকে নিয়ে চল্লিশ জন।" উমার বললেন, "এটাই যথেষ্ট। আজ থেকে আমরা এই চল্লিশ জনই কাবা গৃহে গিয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদাত করবো। ভরসা আল্লাহর। অসত্যের ভয়ে আর সত্যকে চাপা পড়ে থাকতে দেব না।"

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম) হযরত উমারের (রা) এই সদিচ্ছার উপর হৃষ্টচিত্তে আদেশ দিলেন। হযরত উমার (রা) সবাইকে নিয়ে উলংগ তরবারি হাতে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে কা'বা প্রাংগনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসলিম দলের সাথে হযরত উমারকে (রা) এভাবে কা'বা প্রাংগনে দেখে উপস্থিত কুরাইশগণ যারপর নাই বিস্মিত ও মনোক্ষুন্ন হয়ে পড়লো। তাদের মনোভাব দেখে হযরত উমার (রা) পৌরষকণ্ঠে গর্জন করে বললেন, "আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, কোন মুসলিমের কেশাগ্র স্পর্শ করলে উমারের তরবারি আজ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে।"

কাবায় উপস্থিত একজন কুরাইশ সাহস করে বলল, "হে খাত্তাব পুত্র উমার! তুমি কি সত্যিই মুসলিম হয়ে গেলে? আরবরা তো কদাচ প্রকিজ্ঞাচ্যুত হয় না। জানতে পারি কি তুমি কি জিনিস পেয়ে এমনভাবে প্রতিজ্ঞাচ্যুত হলে?"

হযরত উমার (রা) উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলেন, “মানুষ যার চেয়ে বেশি পাওয়ার কল্পনা করতে পারে না, আমি আজ তেমন জিনিস পেয়েই প্রতিজ্ঞাচ্যুত হয়েছি। সে জিনিস হলো আল কুরআন।”
হযরত উমারের (রা) এরূপ তেজোদৃপ্ত কথা শুনে আর কেউ-ই কোন কথা বলতে সাহস পেল না। বিমর্ষ চিত্তে কুরাইশরা সবাই সেখান থেকে চলে গেল।
অতপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম) সবাইকে নিয়ে কাবা ঘরে নামায আদায় করলেন। সেখানে মুসলিমদের এটাই প্রথম নামায। এর আগে মুসলিমরা অতি গোপনে ধর্ম কাজ করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্যও রক্ষা করতে পারতেন না। এজন্য কে মুসলিম, কে পৌত্তলিক তা চিনবার উপায় ছিলো না। এ ঘটনার পর মুসলিমরা পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধর্মে-কর্মে পৃথক সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হলেন। এ ঐতিহাসিক পরিবর্তন উপলক্ষ্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম) হযরত উমারকে (রা) ‘আল ফারুক’ উপাধিতে ভূষিত করলেন।

আরবের আগুন ঝরা মধ্যাহ্ন। উর্ধ্বাকাশ থেকে মরু-সূর্য যেন আগুন বৃষ্টি করছে। মরুর লু' হাওয়া আগুনের দাব-দাহ নিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে চারদিক। এমনি সময়ে আগুন ঝরা মরুভূমির বুকে নির্যাতন চলছে এক নারীর উপর– সুমাইয়ার উপর। ইসলাম প্রচারের শুরুতেই যাঁরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম) আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, সুমাইয়া তাঁদের একজন। সুমাইয়ার নারী দেহ ভংগুর, স্পর্শকাতর কিন্তু আত্মা তাঁর অজেয়। বক্ষে তাঁর বিশ্বাস– ঈমানের দুর্জয় শক্তি ও সাহস। সে প্রাণ বহ্নি নির্বাপিত হবার মত নয়।

সুমাইয়ার উপর এ নির্যাতন কেন? কেন তাঁকে এই প্রখর মধ্যাহ্নে সূর্যের বহ্নিতলে ক্রুর নির্যাতন চালানো হচ্ছে?

তাঁর অপরাধ এক আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করেছেন, যুগ যুগ ধরে পূজ্য লাত, ওজ্জা- হোবলদের বিরোধীতা করেছেন, তাঁর জীবন-মৃত্যুর সবকিছুই নিবেদন করেছেন আল্লাহর নামে। অমানুষিক নির্যাতনেও সুমাইয়া অচল-অটল। তাঁর দেহ নির্যাতন-নিপিড়নে জর্জরিত হোক, তাঁর কোমল দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাক, তবু অসত্যের কাছে, অত্যাচারের কাছে তাঁর অমর আত্মা কখনো নতি স্বীকার করবে না। এত কষ্ট দিয়েও শক্রর মন টললো না। ইসলামের শত্রু আবু জাহল সুমাইয়ার অবিচল নিষ্ঠা, অপূর্ব সাহস-সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা দেখে অস্থির হয়ে তাঁর দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারল। বর্শা গিয়ে সুমাইয়ার নিম্নাংগ ভেদ করলো। সুমাইয়ার

দেহ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। তাঁর মৃত্যুজয়ী আত্মা চলে গেল জান্নাতে। দু'মুঠো মাটির দেহ তাঁর পেছনে পড়ে রইলো। আত্মা তাঁর আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল।

সুমাইয়ার পবিত্র রক্তে আরবের মাটি রঞ্জিত হলো-সেই রক্তে উত্তপ্ত হলো ভবিষ্যতের শত সহস্র শাহাদাত-আত্মত্যাগের বীজ।

সত্যের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ যাঁর, মৃত্যুতে তাঁর কিসের ভয়, কিসের শংকা। সুমাইয়ার কন্যা হযরত উমামার উপরও চলল অকথ্য নির্যাতন। তপ্তবালুর উপর-পাথরের উপর তাঁকে জোর করে শুইয়ে রাখা হতো। উত্তপ্ত মরুর সূর্য প্রখর কিরণে তাকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতো। মধ্যাহ্নে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরে। উষ্ণ লু-হাওয়া তাঁর সর্বাঙ্গ ঝলসে দিত-আত্মা তবু নতি স্বীকার করেনি। অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মশক্তি চালিয়েছে তার অবিশ্রান্ত দুঃসাহসী সংগ্রাম-দুঃখ জয়। মৃত্যুজয়ী আত্মা সগৌরবে তুলে ধরেছে- দিকে দিকে মেলে দিয়েছে সত্যের জয় পতাকা।

বড় লাভের ব্যবসা করলে, সুহাইব

নবুওয়াতের তখন একদম শিশুকাল। নবুওয়াতের বাতি জ্বলছে। জ্বলছে মক্কার ছোট গন্ডির মধ্যে। জাহিলিয়াতের অন্ধকার এ আলোক শিখাকে গলাটিপে মারার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত। কিন্তু নবুওয়াতের আলোক শিখা যে আলোক শিশুদের তৈরী করেছে, তারা জগৎ জোড়া সহনশীলতা নিয়ে নীরবে আত্মরক্ষা করে চলেছে। এ ধরনেরই এক আলোক-শিশু হযরত সুহাইব (রা)। অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চলছে তাঁর উপর। চরম সহনশীলতার প্রতীক সুহাইব সব অত্যাচার, সব নির্যাতন সয়ে যাচ্ছেন নীরবে। আল্লাহর এ সৈনিকদের উপর এ অমানুষিক নির্যাতন কেমন করে কত দিন আর সয়ে যাবেন মহানবী (সা)। তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। সকলের মত সুহাইবকেও মহানবী (সা) একদিন মক্কা থেকে হিজরাত করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশের সংগে সংগেই সুহাইব সিদ্ধান্ত নিলেন হিজরাতের। মহানবীর (সা) নির্দেশের কাছে, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কাছে স্বদেশের মায়া, স্বীয় সহায় সম্পদের মায়া মুহূর্তে উবে গেল। কাউকে কিছু না বলে একদিন হিজরাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন সুহাইব। সাথে পরিধানের পোশাক টুকুও আত্মরক্ষার জন্য কিছু অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। সুহাইবের এ যাত্রা ধরা পড়ে গেল কুরাইশ চরদের চোখে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এল একদল কুরাইশ। তারা সুহাইবকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায় মক্কায়। সুহাইব মক্কার বাইরে গিয়ে দল পাকাবে, মুসলমানদের দল ভারি করবে কুরাইশরা তা হতে দেবে কেন? কিন্তু সুহাইব একাই রুখে

দাঁড়ালেন কুরাইশ দলটির বিরুদ্ধে। বললেন, "তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তীর ফুরিয়ে গেলে তরবারি আছে। তরবারি ভেঙে গেলে কিংবা হাতছাড়া হলে তারপর তোমরা আমাকে যা খুশি করতে পার। এত কিছুর চেয়ে বরং ভালো, তোমরা মক্কায় আমার যা কিছু মাল-সম্পদ আছে সব নিয়ে নাও, আর আমি চলে যাই।" কুরাইশদল অর্থের সন্ধান পেয়ে সুহাইবকে ধরার বিপদপূর্ণ ঝুঁকি না নেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করল। তারা পথ ধরল মক্কার আর সব বিসর্জন দিয়ে, মাতৃভুমির মায়া কাটিয়ে রিক্ত-নিঃস্ব সুহাইব অনিশ্চিতের পথে পাড়ি জমালেন। এদের সম্পর্কেই আল কুরআন বলছেঃ "এমনও লোক আছে যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের জীবনটাকে কিনে নেয়, আল্লাহ নিজের বান্দাদের উপর সর্বদাই দয়াশীল।"

মহানবীর (সা) হিজরতের পর মদীনার সন্নিকটবর্তী পল্লীর একটি দিন। নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত ঘটল সুহাইবের। নবী তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, "বড় লাভের ব্যবসাই করলে, সুহাইব।"

সুহাইবকে উঁচু মর্যাদা দিতো সকলেই। হযরত উমার (রা) তাঁর মুমুর্ষ অবস্থায় অছিয়ত করেছিলেন তাঁর জানাযার নামায যেন সুহাইবের দ্বারা পড়ান হয়।

সেদিন গভীর নিশীথে মহানবী (সা) হিজরত করেছেন। তাঁর ঘরে তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন হযরত আলী (রা)। মহানবীর কাছে গচ্ছিত রাখা কিছু জিনিস মালিকদের ফেরত দেবার জন্য মহানবী (সা) হযরত আলীকে (রা) রেখে গেছেন। হযরতকে হত্যা করতে আসা কুরাইশরা আলীকে মহানবী মনে করে সারারাত পাহারা দিয়ে কাটালো। ভোরে তারা হযরতের শয্যায় আলীকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো। তারা হযরত আলীকে তরবারির খোঁচায় জাগিয়ে বললো, "এই, মুহাম্মাদ কোথায়?"

নির্ভীক তরুণ হযরত আলী উত্তর দিলেন, "আমি সারারাত ঘুমিয়েছি, আর তোমরা পাহারা দিয়েছো। সুতরাং আমার চেয়ে তোমরাই সেটা ভালো জান।"

হযরত আলীর উত্তর তাদের ক্রোধে ঘৃতাহূতি দিল। তারা তাঁকে শাসিয়ে বলল, "মুহাম্মাদের সন্ধান তাড়াতাড়ি বল, নতুবা তোর রক্ষা নেই।"

হযরত আলীও কঠোর কণ্ঠে বললেন, "আমি কি তোমাদের চাকর যে তোমাদের শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রেখেছি? কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত করছো?" একটু থেমে আলী কয়েকজনের নাম ধরে ডেকে বললেন, "তোমরা আমার সাথে এস। তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ আছে।" কথা শেষ করে হযরত আলী পথ ধরলেন।

যাদের নাম উল্লেখ করলেন তিনি, তারাও তাঁর পিছু পিছু চললো। তাদের হাতে উলংগ তরবারি। তাদের মনে একটি ক্ষীণ

আশা, হয়ত হযরত আলী তাদেরকে মুহাম্মাদের (সা) সন্ধান দিতে নিয়ে চলেছেন।

হযরত আলী এক গৃহদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছনে ফিরে ওদের বললেন, "দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।" বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। পেছনের কয়েকজনের অন্তরে তখন 'কি হবে না হবে' অপরিসীম দোলা। তাদের মনে আশঙ্কাও। উলংগ তরবারি হাতে তারা পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত।

এমন সময় হযরত আলী বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে কয়েকটি ধন-রত্নের তোড়া। তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে ধন-রত্নের তোড়া তাদের সামনে ধরে বললেন, "নাও, তোমরা নাকি বহুদিন পূর্বে তোমাদের ধন-রত্নাদি হযরত মুহাম্মাদের (সা) কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে? ভেবেছিলে, গচ্ছিত ধন আর পাবেনা। আজ তিনি তোমাদের অত্যাচারেই দেশত্যাগী হয়েছেন। কিন্তু তোমাদের গচ্ছিত সম্পদ তোমাদের হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন। এই নাও তোমাদের গচ্ছিত ধন।"

এই কুরাইশরা যে এত শত্রুতার পরও তাদের ধন-রত্ন ফিরে পাবে, সে কথা কল্পনাও করেনি। তাই তারা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ 'সত্যই কি আল-আমীনের ন্যায় বিশ্বাসী ও সত্যবাদী লোক বিশ্বে আর নেই? তবে কি তিনি সত্য পথেই আছেন? আমরাই ভ্রান্ত পথে আছি? তাঁকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে পেয়েছি নিঃস্বার্থ প্রেমের আহবান-মানুষ হবার উপদেশ। আজ তাঁর প্রাণ নিতে এসেছিলাম, প্রাণ দিতে না পেরে দিয়ে গেলেন গচ্ছিত ধন-রত্ন? আহ! মুহাম্মাদ (সা) যদি আমাদের ধর্মদ্রোহী না হতেন, তাঁর পদানত দাস হয়ে থাকতেও আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি ছিলনা।'

বদর যুদ্ধের জোর প্রস্তুতি চলছিল তখন মদীনায়। মক্কার দিক থেকে অহরহ খবর এসে পৌঁচছে, বিপুল সজ্জা আর বিরাট বাহিনী ছুটে আসছে মদীনার দিকে। কিন্তু সে তুলনায় মদীনায় যুদ্ধ প্রস্তুতি কিছুমাত্র নেই। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যেমন স্বল্প, তেমনি মুসলিম যোদ্ধা সংখ্যাও নগণ্য। প্রতিটি সাহায্য প্রতিটি সহায়তাকারীকেই তখন সাদরে স্বাগত জানানো হচ্ছে সেখানে। এমন সময়ে হুযাইফা মরুভূমির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় মহানবীর (সা) দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি গাতফান গোত্রের আবস খান্দানের লোক। মুসলিম তিনি। কুফরের সাথে ইসলামের শক্তি পরীক্ষার প্রথম মহাসাগরে অংশ নেয়ার আকুল বাসনা নিয়ে তিনি মদীনায় এসেছেন। পথের কত বিপদ মাড়িয়ে, বাধার কত দুর্লঘ্য দেয়াল পেরিয়ে তিনি এসে পৌঁচেছেন মদীনায়। মদীনায় যুদ্ধ আয়োজন দেখে তাঁর চোখ মন জুড়িয়ে গেল।

শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে পরম প্রশান্তি নিয়ে হুযাইফা দরবারে নববীতে গিয়ে বসলেন। কুশল বার্তা দিতে গিয়ে মহানবীকে (সা) তিনি পথের বিপদ আপদ ও অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। তিনি বললেন, "পথিমধ্যে কুরাইশরা আমাকে আটক করে বলে মুহাম্মাদের কাছে যাওয়ার অনুমতি নেই।" আমি বললাম, "মুহাম্মদের (সা) কাছে নয়, মদীনায় যাচ্ছি।" অবশেষে তারা বলল, "ঠিক আছে, তোমাকে ছাড়তে পারি। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে, মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদের পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধে যোগ দেবে না।"

"আমি তাদের এ শর্তে রাজী হয়েই তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মদীনায় এসেছি।"

হুযাইফার শেষ কথাটি শুনেই মহানবী (সা) চোখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন। বললেন, "তুমি কথা দিয়েছ তাদের যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবে না তুমি?"

হুযাইফা স্বীকার করলেন। মহানবী (সা) তখন তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর। গৃহে ফিরে যাও। সাহায্য ও বিজয় আল্লাহর হাতে। আমরা তাঁর কাছেই তা চাইব।"

হুযাইফার চোখে নেমে এল আঁধার। আশা ভংগের দুঃখ, জিহাদে যোগ দিতে না পারার বেদনায় মুষড়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু উপায় নেই। মহানবীর (সা) কাছে প্রতিশ্রুতি ভংগের প্রশ্রয় পাবার নেই কোন সামান্য উপায়। হুযাইফার চোখের সামনেই মদীনা থেকে যুদ্ধযাত্রা হলো বদরের দিকে। আর মহানবীর (সা) নির্দেশ শিরে নিয়ে হুযাইফা পা বাড়ালেন বাড়ীর পথে।

৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা হিজরী সনের কথা। ইসলামী রাষ্ট্র তখন সবেমাত্র শিশু। একজন আরব শেখ নবীর (সা) কাছে এক দূত পাঠিয়ে বললেন, "আমার দলের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসুক, কিন্তু এখানে উপযুক্ত কোন ধর্ম প্রচারক নেই। আপনি যদি কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন তবে আমরা বিশেষ বাধিত হবো।" আল্লাহর রাসূল (সা) কয়েকজন ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা আরব শেখের অঞ্চলসীমায় পৌঁছামাত্র সেখানের কয়েকজন গোত্রপতি দলবল নিয়ে তাঁদের ঘিরে ফেললো এবং হয় আত্মসমর্পণ নয় তো মৃত্যু এ দুটোর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে বললো। খন্ড যুদ্ধ হলো। একে একে অনেকেই শহীদ হলেন। বন্দী হলেন খুবাইব (রা)। তাঁকে তুলে দেয়া হলো মক্কার কুরাইশদের হাতে। নৃশংসতম উপায়ে তাঁকে হত্যা করা হবে ঠিক হলো। নির্দিষ্ট দিনে খুবাইবকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য তিনি শেষ অনুরোধ জানালেন। অনুমতি পেয়ে তিনি একটু তাড়াতাড়িই নামায শেষ করলেন। তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "জীবনের শেষ নামায একটু দীর্ঘতর করতেই মৃত্যু পথযাত্রীর ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমি তা অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করলাম, পাছে তোমরা মনে কর আমি ভীত হয়ে কালহরণ করছি।" বধ্যমঞ্চে পাঠাবার পূর্বে তাঁকে শেষ বারের জন্য বলা হলো, "এখনও সময় আছে ইসলাম ত্যাগ করে আবার এক নব জীবন লাভ কর।" ধীর শান্ত ও দৃঢ় স্বরে খুবাইব বললেন, "অসত্যের পথে বেঁচে থাকার চাইতে মুসলমান

হয়ে মৃত্যুকে বরণ করা শতগুণে শ্রেয়। ইসলামে আত্মসমর্পিত জীবনই আমার কাছে সর্বাধিক মূল্যবান।" উঁচু বধ্যমঞ্চে দৃঢ় পদক্ষেপে খুবাইব উঠে গেলেন। চার দিক থেকে নির্মমভাবে বর্শা ও তীর বর্ষিত হতে লাগলো। নির্ভীক খুবাইব নির্বিকার চিত্তে হাসিমুখে রক্তদান করলেন, শহীদ হলেন। দেহ পড়ে রইলো–মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার যাত্রা শুরু হলো–লোক হতে আনন্দলোকে।

সত্যাশ্রয়ী মানুষ যাঁরা জীবন মৃত্যু তাঁদের পায়ের ভৃত্য। তাই তাঁরাই বহন করেন সত্যের আলো, সত্যের পতাকা। প্রেরণার আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়েন প্রাণে প্রাণে, সৃষ্টি করেন নব নব প্রাণলোক।

মুসআব। ধনীর দুলাল মুসআব। প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁর জীবন গড়ে উঠেছে সেই মুসআব সত্যের পথ দুঃখের পথ গ্রহণ করে ফকির হলেন। সহায় নেই, সম্বল নেই, আত্মীয়স্বজন তাঁর প্রতি বিরূপ। একমাত্র সম্বল-একমাত্র পাথেয় তাঁর আল্লাহর প্রেম, সত্যের বাণী। তাঁকে বন্দী করে রাখা হলো। বেপরোয়া নির্যাতন চালানো হলো তাঁর দেহ ও মনের উপর। বন্দীর শৃংখল ভেঙ্গে একদিন তিনি চলে গেলেন সুদূর আবিসিনিয়ায় অন্যান্য মুসলিম মুহাজিরদের সাথে। বহুদিন পর তিনি এলেন মদীনায়। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল অশেষ দারিদ্র,দুঃখ-কষ্ট, কিন্তু অদম্য তাঁর প্রাণশক্তি। পরনে ভালো কাপড় নেই, শতছিন্ন একটি পোষাক কোন মতে তাঁর দেহের আবরু রক্ষা করছে। এমনি ভাবে একদিন একটিমাত্র বস্ত্রে কোনরূপে দেহ ঢাকতে ঢাকতে তিনি পথ চলছেন? হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর এই দুর্দশা নীরবে চেয়ে দেখছিলেন, তাঁর মনে পড়ে গেল মুসআবের ঐশ্বর্যপূর্ণ বিলাসী জীবনের কথা। কত সুখে, আরাম-আয়েশের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে। আর আজ? রাসূলের (সা) চোখে অশ্রু দেখা দিল।

উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র। একদিকে মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী মুসলমান, অন্যদিকে মক্কার কুরাইশগণ। তুমুল যুদ্ধ চলছে। মুসলমানদের পতাকাবাহী মুসআব। কুরাইশদের প্রচন্ড আক্রমণে মুসলমানদের এক সংকটময় মুহূর্ত দেখা দিয়েছে-বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা। নির্ভীক মুসআব ইসলামের পতাকা হস্তে যুদ্ধের প্রচন্ডতা অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন শত্রুর আঘাতে তাঁর দক্ষিণ হস্ত

কেটে পড়ে গেল। বাম হাত দিয়ে তিনি পতাকা ধরে রাখলেন। সে হাতও কাটা গেল। দু'হাতের অবশিষ্টাংশ দিয়ে মুসআব প্রাণপণে ইসলামের পতাকা বুকে ধরে রাখলেন। এ পতাকা নমিত হতে পারে না, যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ তা অসম্ভব। অশান্ত মরুবাত্যায় তখন গর্বভরে নিশান উড়ছে। এ নিশান অবহেলিত হতে পারে না। শত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যাক, মৃত্যুর অশ্রান্ত গর্জন শুনা যাক, তবু সত্যের পতাকা নমিত লাঞ্ছিত হতে পারে না। কখনও না, প্রাণ গেলেও না। অকস্মাৎ একটি তীর এসে মুসআবের বক্ষ ভেদ করে গেল। শহীদী রক্তে মরুর বক্ষ রঞ্জিত করে তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী, আত্মা তাঁর লাভ করলো অমরত্বের অনির্বচনীয় আস্বাদ।

উহুদ প্রান্তরের প্রথম শহীদ

উহুদ যুদ্ধ সমাগত। মদীনার এক পর্ণ কুটিরে যুদ্ধসাজে সেজেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম। হাসি যেন তাঁর মুখ থেকে উপচে পড়ছে। যুদ্ধে বেরুবার আগে তিনি পুত্র জাবিরকে ডেকে বললেন, "পুত্র! আমার অন্তর বলছে, এ যুদ্ধে আমিই সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করব।" কথা বলার সময় তাঁর মুখে যে হাসি, তা দেখে মনে হবে যেন তিনি ঈদের আনন্দে শামিল হতে যাচ্ছেন।

উহুদ যুদ্ধের কঠিন সময়। ভীষণ যুদ্ধ চলছে। হযরত আব্দুল্লাহর কথাই সত্য হলো। তিনি উসামা ইবনে আওয়ার ইবন উবাই এর হাতে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল উহুদের ময়দানে। হযরত আব্দুল্লাহ আগেই ভীষণভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন। তারপর প্রাণহীন তাঁর দেহ যখন লুটিয়ে পড়ল মাটিতে তখনও তাঁর উপর চললো নিপীড়ন। বিকৃত করা হলো তাঁর দেহ। মুখে তাঁর তখনও কিন্তু সেই বেহেস্তী হাসি। আঘাতে আঘাতে বিকৃত তাঁর দেহের দিকে চেয়েই চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল হযরত আব্দুল্লাহর মেয়ে ফাতিমা। মহানবী (সা) সেদিকে চেয়ে তাকে সান্ত্বনার সূরে বললেন, "জানাযা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতারা তাকে ছায়া দান করছে।"

পাহাড়ঘেরা উহুদের এক প্রান্তে আরও একজন শহীদের সাথে তাঁকে দাফন করা হলো। ছ'মাস পর তাঁর পুত্র জাবির তাঁকে সে কবর থেকে তুলে অন্য আর এক কবরে দাফন করে দিলেন। সে

সময়ও তাঁর দেহ ছিল অবিকৃত। মনে হয়েছিল যেন আজই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধের বেশ কিছু দিন পরের এক ঘটনা। এক দিন হযরত আব্দুল্লাহর পুত্র হযরত জাবিরকে কাছে পেয়ে মহানবী (সা) উহুদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ তাঁর পিতা সম্পর্কে একটি শুভ সংবাদ দিলেন। বললেন, "আল্লাহ্ পর্দা ছাড়া সরাসরি কারো সাথে কথা বলেন না। কিন্তু তোমার পিতার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।, 'যা চাও তাই দেয়া হবে।' তোমার পিতা উত্তরে বললেন, 'আমার আশা, আর একবার দুনিয়াতে গিয়ে শহীদ হয়ে আসি।' আল্লাহ্ জবাব দিলেন, 'যে দুনিয়া থেকে একবার আসে, আর ফিরে যেতে পারে না।' অতঃপর তোমার পিতা তাঁর সম্পর্কে ওহী চেয়েছিলেন। সে ওহী আমার কাছে এসেছেঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত।"

আবদুল্লাহ ও সা'দের অভিলাষ

উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্র। যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ গিয়ে সা'দ ইবন রাবীকে বলল, "চল আমরা একত্রে দোয়া করি। আমি দোয়া করব, তুমি 'আমীন' বলবে। আবার তুমি দোয়া করবে, আমি 'আমীন' বলব।"

প্রথমেই প্রার্থনা করলেন হযরত সা'দ। তিনি দু'টি হাত উর্ধে তুলে বললেন, "হে আল্লাহ, আগামী কালের যুদ্ধে এক ভীষণ যোদ্ধা আমাকে জুটিয়ে দিন তাকে যেন যুদ্ধে পরাজিত করে আমি গাজী হতে পারি আর তার পরিত্যক্ত মাল-সম্ভার আমি লাভ করি।" সা'দের এ প্রার্থনায় আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ 'আমীন' বললেন। তারপর জাহাশের পালা। জাহাশ দু'টি হাত তুলে মহা প্রভুর দরবারে সানুনয় প্রার্থনা জানালেন, "হে আল্লাহ, আগামী কাল যুদ্ধে আমাকে অতি বড় এক শত্রুর মুখোমুখি করুন। আমি যেন সর্বশক্তি দিয়ে তার মুকাবিলা করি এবং অবশেষে যেন শাহাদাতের অমৃত স্বাদ লাভ করতে পারি। শত্রুরা যেন আমার নাক-কান কেটে নেয়। পরে কিয়ামাতের দিন আমি যখন আপনার সমীপে উপস্থিত হবো, তখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন, 'আব্দুল্লাহ, তোমার নাক-কান কেন কাটা গেছে?' তখন আমি উত্তর দেবো, 'হে আল্লাহ, আপনার এবং আপনার রাসূলের রাস্তায় কাটা গেছে। তখন আপনি বলবেন, "হ্যাঁ, সত্যিই আমার রাস্তায় কাটা গেছে।" আবদুল্লাহর প্রার্থনা শেষে সা'দ 'আমীন' বললেন।

পরের দিন উহুদের ঘোরতর যুদ্ধে তাঁদের প্রার্থনা অনুসারেই ঘটনা ঘটল। সা'দ গাজী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জাহাশ তাঁর প্রার্থনা মুতাবিক শহীদ হলেন। সন্ধ্যার সময় যখন শহীদের লাশগুলোর সন্ধান করা হলো, তখন দেখা গেল, যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রভূমিতে আবদুল্লাহ্ শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর নাক-কান কাটা। তাঁর হাতে তখনও তরবারি ধরা। কিন্তু শহীদের সে তরবারির অর্ধাংশ ভাঙা।

পিতা, পুত্র, স্বামীহারা এক মহিলা

উহুদের যুদ্ধে রাসূলের (সা) বহু প্রিয় সাথী নিহত হলেন। সত্যের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। সত্যের আহ্বান তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে অম্লান বদনে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করে প্রাণের শিখা অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখতে। মৃত্যু তাঁদের অমর লোকের সঙ্গীত শুনায়। এ সংগীতে সত্যের পরম আনন্দ তাঁরা লাভ করে। শত বিপদ আপদ শত মৃত্যু পার হয়ে তাঁরা লাভ করেন জীবনের পূর্ণতা। উহুদের যুদ্ধ নবীন মুসলিমদের এই সুযোগ দান করেছিল, মৃত্যুকে বরণ করে অমৃতকে তাঁরা লাভ করেছিলেন। সে এক চরম পরীক্ষার দিন। সংবাদ রটে গেল, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে সেদিন তাঁর প্রিয় অনুচরগণ মানব দেহের প্রাচীর তুলে রক্ষা করেছিলেন।

রাসূলের (সা) মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে একজন আনসার মহিলা ছুটে চললো মাঠের দিকে। এক জন লোককে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলো, "রাসূল কি অবস্থায় আছেন?"

লোকটি জানে রাসূল নিরাপদে আছেন, তাই প্রশ্নের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে বলল "তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন।" মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। নিজকে সংযত করে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, "রাসূল কেমন আছেন, তিনি কি জীবিত?"

"তোমার ভাইও নিহত হয়েছে।"

মহিলা আবার সেই একই প্রশ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল। তখন সে আবার বলল, "তোমার স্বামীও শহীদ হয়েছেন।"

সকল শক্তি একত্র করে মহিলা তিক্ত স্বরে বলল, "আমার কোন পরমাত্মীয় মারা গেছে তা আমি জিজ্ঞাসা করছিনে, আমাকে শুধু বল আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ কেমন আছেন?" লোকটি উত্তর দিলেন,, "তিনি নিরাপদেই আছেন।" মুহূর্তে মহিলাটির বিবর্ণ মুখে আনন্দের আভাস দেখা দিল। উল্লসিত হয়ে সে বললো, "আত্মীয় বন্ধুদের প্রাণদান তবে ব্যর্থ হয়নি।"

ব্যর্থ হয় না। কোন দিনই ব্যর্থ হয় না। একটি প্রাণের একটি পবিত্র জীবনের আত্মাহুতি সত্যের আলোক শিখা, সত্যের উদাত্তবাণীকে আরও তীব্রতর আরও জ্যোতির্ময় করে তোলে।

মৃত্যু ভয় যাদের নেই, সাহস ও অটল বিশ্বাস যাদের বুকে, তাদের জয় সুনিশ্চিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একদল বিশ্বাসী ও নির্ভীক মুসলমান সকল বাধা-বিপত্তি ও মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করেছিল বলেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে। আশার বাণী, শান্তির বাণী প্রচারিত হয়েছে। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষদেশ পর্যন্ত এর প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে শহীদী রক্তের পুণ্য স্রোতধারার উপর। ইসলাম একটি অজেয় শক্তি। অন্যায়, অন্ধকার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ।

'আমরা কাউকে রাজস্ব দেবার মত অবনত হতে পারিনা'

সমগ্র আরব উপদ্বীপের বাছাই করা সৈনিকদল এক যোগে পঙ্গপালের মত ছুটে আসছে মদীনা মনোয়ারার দিকে। ওরা চারদিক থেকে একসাথে মদীনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুদ্র ইসলামী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

মদীনা রক্ষার জন্য তিন হাজার মুসলমান মহানবীর (সা) নেতৃত্বে মদীনা শহর ঘিরে খন্দক কাটছেন। শত্রুরা ছুটে আসছে। হাতে সময় নেই। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিজনকে দশগজ দীর্ঘ ৫গজ গভীর খন্দক খনন করতে হবে। শীতকাল। বরফজমা ঠান্ডা রাতেও তাই অবিরাম কাজ চলছে। তিনদিন থেকে খাওয়া নেই। পেট পিঠে লেগে গেছে। ক্লান্ত-শ্রান্ত সবাই। কিন্তু মুখে তাদের প্রশান্ত হাসি। চোখ থেকে তাদের ভক্তি ও আনুগত্যের পবিত্র জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে। ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে তারা গাইছে,

"আমরা সেই দল যারা মুহাম্মাদের (সা) হাতে শপথ গ্রহণ করেছে জিহাদের, যতক্ষণ তারা জীবিত থাকবে।"

মহানবীও (সা) খন্দক কাটছেন। তাঁর পেটও পিঠে লাগা। পাথর বাঁধা পেটে। ভক্ত সাহাবীরা তাঁকে সাহায্য করতে চাইছেন। তিনি প্রশান্ত হাসিতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন তাদেরঃ তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করগে।

তিন হাজার সাহাবীর অবিরাম শ্রমে ২০ দিনে খন্দক কাটা শেষ হলো। শত্রুরা এসে গেছে। অশান্ত, আদিগন্ত সাগর উর্মির মতো

তারা এসে ঘিরে ফেলল মদীনাকে। মদীনার ছান–আ পর্বতকে পেছনে আর খন্দককে সামনে রেখে সৈন্য সমাবেশ করলেন মহানবী (সা)।

সমগ্র আরব বাহিনী তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে মদীনা বেষ্টন করল। উমাইয়া ইবন হিছন ফুজারীর নেতৃত্বে গাতফান বাহিনী, তুলাইহার নেতৃত্বে আসাদ বাহিনী এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারবের নেতৃত্বে অবশিষ্ট বাহিনী।

অবরোধ চলছে দিনের পর দিন ধরে। মদীনার তিন দিক ঘিরে দাঁড়ানো আরব বাহিনীর তর্জন গর্জনে মদীনার ভূমিও যেন কাঁপছে। স্বয়ং আল্লাহ্ এ সময়কার দৃশ্য সম্পর্কে বলেছেনঃ "উপর নীচ সব দিক থেকেই শত্রু যখন তোমাদের উপর আপতিত হলো, যা দেখে তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ত্রাসে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হলো, আর তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ধারণা করতে লাগলে, তখন মুসলমানদের উপর কঠিন পরীক্ষার সময় এল এবং তাদেরকে সাংঘাতিক রকমের একটি দোদুল্যমান অবস্থায় ফেলে দেয়া হলো।" (সূরা আল–আহযাব)

অবরোধের তীব্রতা এবং শত্রু বাহিনীর জৌলুস ও আস্ফালন দেখে মহানবীও (সা) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চিন্তিত হলেন এই ভেবে, যদি মদীনার আনসারদের মনোবল ভেংগে পড়ে। যদি তারা হতাশ হয়ে পড়ে। মহানবী (সা) এই চরম সংকট মুহূর্তে তাই আনসারদের মনোবলের একবার পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি আনসার সর্দার হযরত সা'দ ইবন উবাদা এবং সা'দ ইবন মুয়াযকে ডাকলেন। ডেকে তাদের মতামতের জন্য বললেন, "মদীনার উৎপাদনের এক–তৃতীয়াংশ দেবার প্রতিশ্রুতি করে আমরা গাতফান বাহিনীকে অবশিষ্ট আরব বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি।" আনসার সর্দারদ্বয় শান্তভাবে মহানবীর (সা) প্রস্তাব শুনলেন।

শুনে ধীর কণ্ঠে আরয করলেন, "এটা যদি আল্লাহর হুকুম হয়, তাহলে অস্বীকার করার উপায় নেই। আর যদি রায় বা ব্যক্তিগত অভিমত হয় তাহলে আমাদের নিবেদনঃ ইসলাম আমাদেরকে যে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে, তা নিয়ে আমরা কাউকে রাজস্ব দেবার মত অবনত হতে পারি না।"

মহানবী (সা) আশ্বস্ত হলেন। নিশ্চিত হলেন, এই উন্নত শির বাহিনীর কাছে শত্রু পক্ষের বিশাল শক্তি বুদ্বুদের মত মিশে যাবে।

খন্দক যুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। মদীনার আউস গোত্রাধিপতি সা'দ ইবন মায়াজ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে রণাঙ্গনে যাচ্ছেন। বনু হারেসার দুর্গের পাশ দিয়ে যাবার সময় দুর্গের উপরে উপবিষ্ট সা'দের মা বললেন, "বাছা, তুমি তো পিছনে পড়ে গেছ, যাও তাড়াতাড়ি।"

যুদ্ধকালে মারাত্মকভাবে তীরবিদ্ধ হলেন মায়াজ। যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলোনা। মহানবী (সা) তাঁকে তাড়াতাড়ি মসজিদের সন্নিকটবর্তী এক তাঁবুতে নিয়ে এলেন। মায়াজ আর যুদ্ধে যেতে পারলেন না। তাঁর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কিন্তু নিজের দিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই, তাঁর বড় চিন্তা, ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতে পারছেন না। আর একটি চিন্তা তাঁর মনকে আকুল করে তুলছিল, তিনি যদি এ আঘাতে মারাই যান, তাহলে ইসলাম বৈরী কুরাইশদের চরম শিক্ষা দেয়ার ঘোরতর যুদ্ধগুলোতে তিনি আর শরীক থাকতে পারবেন না। মায়াজ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন, "হে আল্লাহ, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ যদি অবশিষ্ট থাকে তবে আমাকে জীবিত রাখুন। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমার খুব সাধ জাগে, কারণ তারা আপনার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। আর যদি কোন যুদ্ধ না থাকে, তবে এ আঘাতেই যেন আমার শাহাদাত লাভ হয়।" খন্দক যুদ্ধের পর কুরাইশদের সাথে প্রকৃত অর্থে আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। মক্কা

বিজয়ের সময় ছোট খাট সংঘর্ষ ছাড়া বড় রকমের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

খন্দক যুদ্ধ শেষ হলো, হযরত মায়াজ আর সেরে উঠলেন না। শাহাদাতের দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। মসজিদে নববীর তাঁবুতেই তখনও তিনি থাকেন। শাহাদাতের পরম মুহূর্ত একদিন ঘনিয়ে এল তাঁর। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হযরত মায়াজ। সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা) ছুটে এসে মায়াজের মাথা কোলে তুলে নিলেন। সৌম্য শান্ত, পরম ধৈর্যের প্রতীক আবু বকর (রা) তাঁর মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "আমার কোমর ভেংগে গেছে।" মহানবী (সা) আবু বকরকে (রা) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এরূপ কথা বলা চলে না, আবু বকর।" সিংহ হৃদয় হযরত উমার (রা) মায়াজের পাশে বসে অঝোরে কাঁদছিলেন। সংবাদ শুনে মায়াজের মা ছুটে এলেন। তাঁর চোখে অশ্রু, কিন্তু মুখে তিনি বললেন, "বীরত্ব, ধৈর্য ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে সা'দ সৌভাগ্যশালী হয়েছে।"

উমার ইবনে ইয়াসিরের নামায

নবী (সা) কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। এক পাহাড়ী এলাকায় এসে সন্ধ্যা হলো। পাহাড়ের এই উপত্যকায় রাত্রি কাটাবেন বলে তিনি মনস্থ করলেন। তিনি পাহাড় থেকে কিঞ্চিত দূরে সমতল উপত্যকায় তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিলেন।

রাত্রিবাসের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে তিনি সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কাফিলা ও সৈন্যদলের পাহারায় আজ কাদের রাখা যাবে?" অমনি একজন মুহাজির ও একজন আনসার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ দায়িত্ব আজকের রাতের জন্য আমাদের দিন।" মহানবী (সা) তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টচিত্তে তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, "পাহাড়ের ঐ এলাকা দিয়ে শত্রু আসবার ভয় আছে, ঐ খানে গিয়ে তোমরা দুজন পাহারা দাও।"

মুহাজিরের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন বাশার আর আনসার ব্যক্তির নাম ছিল উমার ইবন ইয়াসির। মহানবীর (সা) নির্দেশ মুতাবিক তাঁরা দুজন পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেলেন। অতঃপর আনসার মুহাজির ব্যক্তিকে বললেন, "আমরা দু'জন এক সংগে না জেগে বরং পালা করে পাহারা দিই। রাতকে দু'ভাগ করে একাংশে তুমি জাগবে, অপর অংশে জাগব আমি। এতে করে দু'জনের একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার ভয় থাকবে না।"

এই চুক্তি অনুসারে রাতের প্রথম অংশের জন্য মুহাজির আব্দুল্লাহ ইবন বাশার ঘুমালেন। আর পাহারায় বসলেন আনসার উমার ইবন ইয়াসির।

পাশে আব্দুল্লাহ ঘুমোচ্ছেন। ইয়াসির বসেছিলেন পাহারায়। শুধু শুধু বসে বসে আর কাহাতক সময় কাটানো যায়। অলসভাবে সময় কাটাতে ভাল লাগছিল না তাঁর। কাজেই অযু করে নামাযে দাঁড়ালেন। এমন সময় পাহাড়ের ওপাশ থেকে আসা শত্রুদের একজনের নজরে পড়ে গেলেন তিনি। এক ব্যক্তিকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর কেউ আছে কিনা তা পরখ করার জন্য আনসারকে লক্ষ্য করে সে তীর ছুড়লো। পরপর দু'টি তীর গিয়ে তাঁর পাশে পড়ল। কিন্তু আনসার অচল অটল ভ্রুক্ষেপহীন। তৃতীয় তীর গিয়ে ইয়াসিরের পায়ে বিদ্ধ হলো। ইয়াসির তবু অচঞ্চল। এই ভাবে পরপর কয়েকটি তীর এসে তাঁর গায়ে বিঁধল। ইয়াসির তীরগুলো গা থেকে খুলে ফেলে রুকু-সিজদাসহ নামায শেষ করলেন। নামায শেষ করে ইয়াসির আব্দুল্লাহকে ডেকে তুললেন। আবদুল্লাহ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। দূরে পাহাড়ের এ পাশে দাঁড়ানো শত্রু একজনের স্থলে দুজনকে দেখে মনে করল, নিশ্চয় আরও লোক পাহারায় আছে। এই ভেবে আর সামনে বাড়তে সাহস পেলো না। পালিয়ে গেল। আবদুল্লাহ জেগে উঠে ইয়াসিরের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন তুমি আমাকে আগেই জাগাওনি?"

আনসার উমার ইবন ইয়াসির বললেন, "আমি নামাযে সূরা কাহাফ পড়ছিলাম। সূরাটা শেষ না করে রুকু দিতে মন চাইছিল না। কিন্তু ভাবলাম, তীর খেয়ে যদি মরে যাই, তাহলে মহানবীর আদিষ্ট পাহারার দায়িত্ব পালন করা হবে না। তাই তাড়াতাড়ি রুকু সিজদা করে নামায শেষ করেছি। এ ভয় যদি না থাকত তাহলে মরে গেলেও সূরাটি খতম না করে আমি রুকুতে যেতাম না।"

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাস। হজ্জযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে আরবের দিকে দিকে। এই মাস থেকে আগামী তিনমাস মক্কাভূমিতে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে, ভুলে থাকবে মানুষ তাদের দ্বেষ-দ্বন্দ্বের কথা। এই উপলক্ষে মহানবীও (সা) মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘোষণা করে দিলেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা। আনন্দ আর উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল মদীনায়।

নির্দিষ্ট দিন এলো। যাত্রা করলেন মহানবী (সা)। তিনি তাঁর প্রিয় উট কাসওয়ার পিঠে সমাসীন। সাথে চৌদ্দশ' সাহাবা। যোদ্ধা নয়, তীর্থযাত্রীর বেশ তাদের। সংগে কুরবানীর ৭০টি উট। ছয় বছর আগে মদীনায় প্রবেশ করার পর এই প্রথম তিনি যাত্রা করলেন মক্কার উদ্দেশ্যে কাবা'র পথে।

তিনি মক্কার সন্নিকটবর্তী 'আসফান' নামক স্থানে পৌঁছে শুনতে পেলেন, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু মহানবী (সা) তো কোন যুদ্ধের জন্য আসেননি। তিনি সোজাসুজি কুরাইশদের সম্মুখীন না হয়ে অন্য পথ ধরে মক্কার এক মঞ্জিল দূরে হুদাইবিয়া নামক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত। স্থানীয় 'খোজা' গোত্রের দল নেতা বুদাইলের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাঁকে কিছুতেই মক্কা প্রবেশ করতে দেবে না, প্রযোজন হলে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত তারা। মহানবী (সা) বুদাইলকে মক্কায় পাঠিয়ে কুরাইশদেরকে তাঁর শান্তি কামিতা ও আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জানালেন। কিন্তু ফল কিছুই হলোনা। মুসলমানদের পর্যবেক্ষণের জন্য

'ওবওয়া' ও 'বেদওয়া' গোত্রের দলনেতাসহ কয়েক ব্যক্তি হুদাইবিয়া গ্রামে এলো। তারাও গিয়ে মহানবীর (সা) সদিচ্ছা সম্পর্কে কুরাইশদেরকে অবহিত করল। কিন্তু তাদের গোঁ দূর হলোনা। মহানবী (সা) তাঁর সদিচ্ছার নিদর্শন হিসেবে তার প্রিয় উট কাসোয়ার পিঠে খিরাশ নামক সাহাবীকে মক্কায় পাঠালেন। কিন্তু তাঁর এ শুভেচ্ছার তারা জবাব দিল মহানবী (সা) উটের ক্ষতি সাধন করে। আর কয়েকটি গোত্রের হস্তক্ষেপে 'খিরাশ' কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন হুদাইবিয়ায়।

অবশেষে মহানবী (সা) হযরত উসমানকে কুরাইশদের সাথে কথা বলবার জন্য মক্কায় পাঠালেন। আলোচনার ফলাফল জানার জন্য মুসলমানরা হযরত উসমানের আগমণ পথের দিকে চেয়ে রইলেন–গড়িয়ে গেল ঘন্টার পর ঘন্টা। কিন্তু হযরত উসমানের দেখা নেই–দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য মরুপথ নির্জন পড়ে আছে সামনে। উদ্বেগ ও আশংকা ছড়িয়ে পড়ল গোটা কাফিলায়। এমন সময় খবর এলঃ হযরত উসমান নিহত হয়েছেন।

শোকের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়তন্ত্রীতে। বিশিষ্ট সাহাবী মহানবীর (সা) জামাতা, ইসলামের অতন্দ্র সৈনিক হজরত উসমানের শোকে মুহ্যমান মুসলমানদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলঃ এ তো উসমানের হত্যা নয়–সত্যের হত্যা। সত্য ও মিথ্যার চিরন্তন বিরোধেরই এ একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র। কেন তারা এ আঘাতকে নীরবে সহ্য করে যাবে? উত্তেজনা ও শপথে দৃপ্ত হয়ে উঠলো প্রতিটি মুসলমান।

মহানবীর ((সা) দৃঢ় কণ্ঠ ধ্বনিত হলঃ "আমাদেরকে অবশ্যই উসমানের রক্তের বদলা নিতে হবে।" মহানবীর (সা) এ উক্তি হুদাইবিয়ার উপস্থিত ১৪০০ বিশ্বাসীর হৃদয়কে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় আকুল করে তুলল।

মহানবী (সা) একটি বাবলা গাছের নীচে গিয়ে বসলেন। দৃপ্ত শপথে দৃঢ় ১৪০০ সৈনিক একে একে মহানবীর (সা) হাতে হাত রেখে শপথ নিলেন, "হযরত উসমান হত্যার বদলা আমরা নেব। আমরা মরে যাব, তবু লড়াইয়ের মাঠ থেকে পিছু হটব না।"

শত্রু দেশে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় ১৪০০ মুজাহিদ। যুদ্ধের কোন অস্ত্রশস্ত্রই তাঁদের কাছে নেই, আছে শুধু আত্মরক্ষার জন্য একটি করে তরবারি। তবু শত্রুর মুকাবিলা ও অন্যায়ের প্রতিকারেরই শপথ নিলেন তাঁরা। তাঁদের এ শপথের নির্ভরতা ছিল অস্ত্রের উপর নয়–ঈমানের উপর, ঈমানী শক্তির উপর। আর ঈমানের শক্তি অস্ত্র বলের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী, বাবলা গাছের সেই শপথ তা ক্ষণকাল পরেই প্রমাণ করে দিল। প্রমাণ করে দিল, অন্যায়ের প্রতিরোধ আর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় মুসলমানরা যদি আত্মোৎসর্গিত হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য কত দ্রুত নেমে আসে।

মুসলমানদের শপথের কথা যথা সময়ে মক্কায় পৌঁছল। কুরাইশ বিবেক এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মুসলমানদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র না থাকলেও এবং তারা নগণ্য সংখ্যক হলেও তাদের ভীষণ শপথের কথা কুরাইশদের ভীত করে তুলল। তারা মুসলমানদের শৌর্য–বীর্য দেখেছে। জেনেছে তারা যে মুসলমানরা না মেরে মারা যায় না। সুতরাং তারা তাদের ভুল সংশোধন করল। বন্দীদশা থেকে ছেড়ে দিল উসমানকে। তার সাথে সাথে কুরাইশরা বাড়িয়ে দিল সন্ধির হাত মুসলমানদের কাছে। মহানবীর (সা) সাথে হুদাইবিয়া গ্রামে এসে সাক্ষাত করল কুরাইশ প্রতিনিধিরা।

বারবার প্রতিনিধি প্রেরণ এবং পুনঃপুনঃ অনুরোধ কুরাইশদের যে যুদ্ধতৃষ্ণা মেটাতে পারেনি, পারেনি তাদের যে বিবেক বোধ জাগ্রত করতে, ঈমান দীপ্ত বাবলাতলার শপথ তা সম্ভব করে দিল।

নীতিই উর্ধে স্থান পেলো

মক্কার কিছু দূরে হুদাইবিয়া গ্রাম। বিরাট এক বৈঠক বসেছে। বৈঠকে রয়েছেন মহানবী (সা) এবং উল্লেখযোগ্য সব সাহাবী। মুশরিক কুরাইশদের পক্ষ থেকে রয়েছে কয়েকজন প্রভাবশালী সরদার। হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছে। কিন্তু তখনও লিখা শুরু হয়নি। এমন সময় মক্কা থেকে আবু জান্দাল এসে সেখানে হাজির হলো। তার হাতে-পায়ে শিকল। সারা গায়ে তার নির্যাতনের চিহ্ন। মুসলমান হওয়ার অপরাধে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। পুনরায় পৌত্তলিক ধর্মে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার আত্মীয়-স্বজন তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। কত দিন আর নির্যাতন সইবে সে। মুক্তির আশায় সে পাগল হয়ে উঠেছিল। এই সময় সে জানতে পারে, মহানবী (সা) তাঁর চৌদ্দশ' সাহাবাসহ হুদাইবিয়া পর্যন্ত এসে যাত্রা বিরতি করেছেন। অনেক আশা তার মনে, একবার কোন ক্রমে যদি মহানবীর (সা) কাছে গিয়ে সে পৌছতে পারে, তাহলেই তার জীবনে এসে যাবে চির মুক্তির সুবহে সাদিক। আবু জান্দাল হুদাইবিয়ার সে বৈঠকে হাজির হয়ে মহানবীকে (সা) তার সব কথা জানিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলো। আবু জান্দালের নির্যাতনের কাহিনী শুনে উপস্থিত মুসলমানদের মনে বেদনার তরংগ বয়ে গেল।

আবু জান্দাল হুদাইবিয়ার বৈঠকে পৌছার পর পরই আবু জান্দালের পিতা সুহাইল তার মুখে কয়েকটি চপেটাঘাত করল এবং আবু জান্দালকে তার হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য মহানবীর

(সা) কাছে দাবী জানাল। সে বলল, 'হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তানুসারে আবু জান্দালকে আপনারা রাখতে পারেন না। তাকে আপনারা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। (হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, মক্কার কোন লোক মুসলমান হয়ে কিংবা অন্যভাবে মুসলমানদের আশ্রয়ে গেলে তাকে মক্কাবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে)।

সুহাইলের কথা শুনে মহানবী (সা) বললেন, 'সন্ধি এখনো লিখিত হয়নি, স্বাক্ষর তো হয়ইনি। সুতরাং এর শর্ত এই মূহূর্তে মেনে নেয়া কি খুবই জরুরী?'

সুহাইল কিন্তু নাছোড় বান্দা। সে বলল, 'সন্ধি লিখিত ও স্বাক্ষরিত না হলেও কথা তো পাকাপাকি হয়ে গেছে। সতরাং আবু জান্দালকে আমি অবশ্যই ফিরে পাব।'

মহানবী (সা) সুহাইলের কথার জবাব দিলেন না। সুহাইলের কথা যে অমূলক নয়, তা তিনি জানেন। যা উভয় পক্ষে স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। চিন্তিত হলেন তিনি। মহানবীকে (সা) নীরব থাকতে দেখে মুসলমানরাও আশংকিত হয়ে পড়লেন। কি জানি, তাদের এক ভাইকে নাকি আবার কাফিরদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হয়। মহানবী (সা) অত্যন্ত নরম ভাষায় আবু জান্দালকে ফেরত না চাইবার জন্য সুহাইলকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু মহানবীর বিনীত প্রার্থনাতেও সুহাইলের মন গলল না।

মহানবীর (সা) সামনে তখন উভয় সংকট। একদিকে সন্ধির শর্ত রক্ষা, অন্যদিকে একজন মুসলমানকে কাফিরদের হাতে ফেরত না দেয়া। সন্ধির শর্ত যেহেতু আগেই নির্ধারিত হয়েছে, তাই সন্ধির শর্ত পালনই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠল। আবু জান্দাল যখন বুঝল যে, তাকে পুনরায় কাফিরদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন সে করুণভাবে কেঁদে উঠল। বলল, "আমি মুসলমান হয়ে আপনাদের

কাছে আশ্রয় নিলাম। আর আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। কত অত্যাচার, কত যন্ত্রণা যে আমাকে ভোগ করতে হয়, তাতো আপনারা জানেন না।"

আবু জান্দালের কথা শুনে উপস্থিত প্রতিটি মুসলমানের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। মন তাদের বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়, না আমাদের ভাইকে আমরা ফিরিয়ে দেব না। দরকার হলে, তাকে রক্ষার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করব। কিন্তু মহানবীর (সা) সৌম্য শান্ত ভাবনার গভীরে নিমজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে তারা কিছুই বলতে পারল না।

ব্যথা-বেদনার রাজপথ বেয়ে আবু জান্দালকে বিদায় দেবার সময় মহানবী (সা) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আবু জান্দাল, আল্লাহর নামে ধৈর্য ধর, আল্লাহই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।" চোখ মুছে আবু জান্দাল আবার ফিরে চলল মক্কায়। ন্যায়-বিচার ও স্বীকৃত নীতিবোধকে এ ভাবেই মুসলমানরা সব সময় সবার উর্ধে স্থান দিয়েছেন।

পরাজিত হুনাইনের বিজয়ের ডাক ঃ
হে বৃক্ষতলে শপথকারীগণ

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী হুনাইনের পার্বত্য অঞ্চল আওতাস। আরবের বিখ্যাত হাওয়াযেন ও সাকিফ গোত্র তাদের অন্যান্য মিত্র গোত্রসহ বিরাট এক বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে শিবির গেড়েছে। তারা চায়, মক্কাজয়ী ইসলামী শক্তির উপরে শেষ এবং চূড়ান্ত আঘাত হানতে। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছে তাদের নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকেও। উদ্দেশ্য, এদের বিপদ ও ভবিষ্যত চিন্তা করে যাতে কেউ যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ না করে। হাওয়াযেন ও সাকিফ গোত্রের বিখ্যাত তীরন্দাজরা গিরিপথ ও গিরিখাতগুলোতে গোপন অবস্থান গ্রহণ করেছে।

অষ্টম হিজরী। শাওয়াল মাস। মহানবীর (সা) নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী হাওয়াযেন ও সাকিফ বাহিনীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। মহানবী (সা) এই প্রথমবারের মত একটি মিশ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন। মুসলিম বাহিনীতে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিম ছাড়াও প্রায় দু'হাজারের মত এমন লোক শামিল ছিল যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে মুসলিম সৈন্যদলের অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ। তাঁর অধীনের অধিকাংশই ছিল অতিমাত্রায় উৎসাহী নব্য দীক্ষিত তরুণের দল। সুসজ্জিত ও বিশাল মুসলিম বাহিনীর মনে সেদিন এমন একটি ভাবের সৃষ্টি হলোঃ 'আজ আমাদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন সাধ্য কার?'

যুদ্ধ শুরু হলো। হাওয়াযেনদের তীর বৃষ্টি গোটা প্রান্তরকে ছেয়ে ফেলল। অগ্রবর্তী বাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দিল। সে বিশৃংখলা সংক্রামক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা বাহিনীতে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সবাই ছুটে পালাতে লাগল। সমগ্র যুদ্ধের ময়দানে শুধু এক ব্যক্তি তাঁর জায়গায় স্থির ও অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মহানবী (সা)। ময়দানের এক প্রান্তে তখন হযরত উমার (রা)। তলোয়ার থেকে একজন কাফিরের রক্ত মুছতে মুছতে আবু কাতাদাহ (রা) তাঁর সমীপবর্তী হয়ে বললেন, "মুসলমানদের অবস্থা কি?" সিংহ হৃদয় হযরত উমার (রা) অবনত মুখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "এটাই আল্লাহর ফায়সালা ছিল।"

বৃষ্টির অবিরাম ধারার মত তীর ছুটে আসছে। এই তীরবৃষ্টির মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছেন মহানবী (সা)। তিনি চারদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেনঃ শূণ্য মাঠ, কেউ কোথাও নেই। তিনি ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে চোখ ফিরালেন। তাঁর দরাজকণ্ঠে ধ্বনিত হলোঃ 'হে আনসারবৃন্দ!' সঙ্গে সঙ্গে সে শূণ্য প্রান্তর পেরিয়ে উত্তর এলঃ 'আমরা উপস্থিত আছি।' মহানবী (সা) বাম দিকে তাকিয়ে সে একই আহবান জানালেন। দক্ষিণের সে উত্তর এল বাম দিক থেকেও। এর পর মহানবী (সা) তাঁর বাহন থেকে নেমে পড়লেন। এ সময় হযরত আব্বাস (রা) এসে পড়লেন। মহানবীর (সা) নির্দেশে হযরত আব্বাসের (রা) সুউচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "হে আনসারবৃন্দ! হে বৃক্ষতলে শপথকারীগণ।"

এই মর্মস্পর্শী আহবান কর্ণকুহরে পৌছার সাথে সাথে ঝড়ের বেগে মুসলিম সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এল। সর্বাগ্রে পৌছার আকাংখায় এমন ভিড় জমে গেল যে, অনেকের পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে আসা সম্ভব হলো না। তারা ঘোড়া ফেলে রেখে আবার অনেকে শরীরটাকে হালকা করার জন্য গায়ের বর্ম ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাগল

প্রায় ছুটে এল যুদ্ধ ক্ষেত্রে। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় কিছু নিখাদ হয়ে ফিরে আসা মুসলিম বাহিনী বদর, উহুদ ও খন্দকের সেই রূপ আবার ফিরে পেল। মুহূর্তে ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড়। সমগ্র আরবের অদ্বিতীয় দুর্ধর্ষ তীরন্দাজ হাওয়াযেন ও সাকিফদের তীরের প্রাচীরও আর মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করতে পারলো না। সাকীফ গোত্রের প্রধান সেনানায়ক উসমান ইবন আবদুল্লাহ নিহত হলো। শত্রুপক্ষ রণে ভংগ দিয়ে পালাল। যারা পালাতে পারল না তারা বন্দী হলো। এই হুনাইনের যুদ্ধে ছ'হাজার শত্রু বন্দী হল এবং চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ছাগ-ছাগী ও চার হাজার উকিয়া চান্দী মুসলমানদের হাতে এসে পড়ল।

তায়েফের সন্নিকটবর্তী জিরানা লোকালয়। হুনাইন যুদ্ধের ছ'হাজার বন্দী এখনও জিরানার মুসলিম শিবিরে বন্দী। তায়েফের অবরোধ শেষ করে মহানবী (সা) ফিরে এলেন জিরানার শিবিরে।

জিরানায় যারা বন্দী ছিল সবাই হাওয়াযেন গোত্রের লোক। হাওয়াযেন গোত্রের একটি শাখা বনু সা'দ। এই বনু সা'দ মহানবীর (সা) দুধমাতা হালিমার কবিলা। এদের সাথেই হেসে-খেলে মহানবীর (সা) শিশুকালের ৫টি বছর কেটেছে। বনু সা'দ কবিলার লোকেরাও হাওয়াযিনদের সাথে বন্দী ছিল জিরানায়।

মহানবী (সা) জিরানায় ফিরে এলে হাওয়াযেনদের একটি সম্মানিত প্রতিনিধিদল মহানবীর (সা) সাথে এসে দেখা করলেন। প্রতিনিধি দলের নেতা যুহাইর ইবন সা'দ মহানবীর (সা) কাছে এসে আরজ করলেন, "যারা বন্দী শিবিরে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে আপনার ফুফু ও খালারাও রয়েছেন। খোদার কসম, যদি আরবের সুলতানদের মধ্য থেকে কেউ আমাদের বংশের কারো দুধ পান করতেন, তাহলে তাঁর কাছে আমাদের অনেক আকাংখা আবদার থাকতো। আর আপনার কাছ থেকে আমরা আরও বেশী আশা রাখি।"

মহানবী (সা) সাগ্রহে তাদের কথা শুনলেন। বোধ হয় তাঁর মন ছুটে গেল সুদূর অতীতের এক দৃশ্যে। ভেসে উঠল তাঁর চোখে, হাওয়াযেনদের উপত্যকা ও প্রান্তর ভূমি। ফুফু-খালা যারা বন্দী

তাঁদের স্নেহ তাঁকে কতইনা শান্তির স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়েছে। কিন্তু তিনি তো কোন রাজা নন, কিংবা নন কোন ডিক্টেটর অথবা স্বেচ্ছাচারী সম্রাট। সব মুসলমানের স্বার্থ ও মতামত যে বন্দীমুক্তির সাথে জড়িত সে বন্দীদের তো তিনি তাঁর একার ইচ্ছায় ছেড়ে দিতে পারেন না। এ অধিকার সকলের, সকলের সামনেই এটা পেশ করা দরকার। মহানবী (সা) শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "যুহাইর! যুদ্ধ বন্দীদের উপর আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের অধিকার যতটুকু, তা আমি এই মুহূর্তে ত্যাগ করছি। আর অন্যান্য সকল যুদ্ধ বন্দীর মুক্তির জন্য যোহরের নামাযের পর সমবেত মুসলমানদের কাছে আবেদন কর।"

সে দিনই যোহরের নামাযের পর হাওয়াযেনদের প্রতিনিধি দলটি এসে মুসলমানদের সামনে দাঁড়াল। আবেদন জানাল তারা বন্দীদের মুক্তির জন্য আগের মত করেই। মহানবী (সা) ঠিক আগের মত বললেন, "আমি আমার কবিলার লোকদের অধিকার রাখি, আমি তাদের দাবী পরিত্যাগ করছি। আর মুসলমানদের সকলের কাছে সমস্ত বন্দীর মুক্তির জন্য সুফারিশ করছি।" সমবেত আনসার ও মুহাজির সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, "আপনার কবিলার মত আমাদের অধিকারও আপনার উপর অর্পিত হলো।" এর পর মহানবী (সা) ছ'হাজার বন্দীর সকলকেই মুক্তি দিলেন। মহানবী (সা) ইচ্ছা করলে সব বন্দীকে আগেই নিজের ইচ্ছায় মুক্তি দিতে পারতেন। কেউ-ই প্রতিবাদ করতোনা। কিংবা অসন্তুষ্টও হতো না কেউ। কিন্তু সব যুগের সব মানুষের আদর্শ মহানবী তা করেননি। মুসলমানদের শাসক, অধিনায়ক যাঁরা তাঁরা মুসলমানদেরই একজন হবেন, তাঁর অধিকারের সীমাও সকলের চেয়ে বেশী কিছু হবে না, এ উজ্জ্বল শিক্ষাই চিরন্তন করে রাখলেন তিনি পৃথিবীতে।

মুতার রণাংগনে আত্মত্যাগ

মুতার যুদ্ধ ক্ষেত্র। সিরিয়ার রোমক শাসক শুরাহবীলের নেতৃত্বে এক লক্ষ রোমক সৈন্য দন্ডায়মান। যুদ্ধক্ষেত্রে এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদ দাঁড়িয়ে। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন যায়েদ ইবন হারেসা। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি যায়েদ শহীদ হলেন। মহানবীর (সা) পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন জাফর ইবন আবী তালিব। এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের এক অদ্ভুত অসম যুদ্ধ চলছে। জাফরের এক হাতে পতাকা, অন্য হাতে তাঁর তরবারি। ভীষণতর যুদ্ধে মেতেছেন তিনি। যুদ্ধে প্রথমে তাঁর ডান হাত কাটা গেল, পরে বাম হাত। তাঁর বাম হাত ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে পিছন দিক থেকে এক আঘাত এসে পড়ল তাঁর দেহে। দ্বিখন্ডিত হয়ে ঢলে পড়ল তাঁর দেহ। জাফর যখন শহীদ হলেন, তখন মহানবীর (সা) মনোনীত পরবর্তী সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহা যুদ্ধ ক্ষেত্রের এক কোণে বসে এক টুকরা গোশত খাচ্ছিলেন। দু'দিন আগে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আর তিনি কিছু খাননি। তিনি যখন খাচ্ছিলেন, সে সময় তাঁর নামে ডাক এল। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে গোশত ফেলে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নিজকে সম্বোধন করে বললেন, "জাফর শহীদ হয়ে গেল, আর তুই এখনো দুনিয়ায় ব্যস্ত।"

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহা সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করলেন। ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন তিনি। এক আঘাতে তাঁর একটি আঙ্গুল কেটে গেল। মুহূর্তের জন্য আবদুল্লাহ

ইবন রওয়াহা একটু দমে গেলেন। বোধ হয় একটু দ্বিধা কিংবা ভয় এল তার মনে। কিন্তু দ্বিধা–ভয় ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'হে অন্তর, এখন কিসের জন্য এ চিন্তা! স্ত্রী! আচ্ছা, তাকে তালাক! গোলাম! তাকে আযাদ করে দিলাম। বাগবাগিচা! ঐগুলো আল্লাহর রাস্তায় সদ্‌কা করে দিলাম।'

আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহার নেতৃত্বে ভীষণতর সংগ্রাম চলতে লাগল 'মুতা' রণাঙ্গনে।

মুতা যুদ্ধে যাত্রা করার সময় আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহা বলেছিলেন, "আল্লাহর দরবারে আমার গুনাহর জন্য মাফ চাচ্ছি। আমার জন্য এমন তরবারি আসুক, যদ্বারা ঝরনার মত আমার রক্ত প্রবাহিত করা হবে কিংবা শত্রু এমন বর্শা দিয়ে আমাকে আঘাত করবে যা আমার হৃদপিন্ড বিদীর্ণ করে দেবে এবং লোকেরা আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে, তখন তারা বলবে, আল্লাহ তোমাকে কৃতকার্য এবং তাঁর প্রিয় হিসেবে গ্রহন করুন। বস্তুতঃ তুমি তো প্রিয় এবং সফলকামই ছিলে।"

আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহার এ আকাংখা সফল হয়েছিল। শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা তিনি পান করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার বলেন, "যুদ্ধের পরে যখন আমরা দাফনের জন্য আবদুল্লাহ ইবন রওয়াহার লাশ সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম; তখন দেখা গেল, তাঁর শরীরের উপরিভাগে ৯০টি জখম রয়েছে।" যায়েদ, জাফর, আবদুল্লাহ এবং জানবাজ মুজাহিদদের এই আত্মত্যাগই এক লক্ষ রোমক সৈন্যের মনে দারুন বিস্ময় ও ভয় সৃষ্টি করেছিল।

জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য আয়াত নাযিল করতে হলো

৬৩৫ সাল। নভেম্বর মাস। আরবে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। তার উপরে অবিশ্বাস্য রকমের গরম। বালুময় দেশ আরব। এই বালুর উপরই নামছে আগুনঝরা রৌদ্র। মরুভূমি-প্রান্তের শীর্ণ গাছগুলো ঝলসে যাচ্ছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে অসহ্য গরম, এই দুইয়ে মিলে গোটা আরবে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এমনি সময়ে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ এল মদীনায়। মারাত্মক সংবাদ। সিরিয়া থেকে সদ্য ফিরে আসা একদল ব্যবসায়ী মহানবীকে (সা) এসে জানাল, রোম সম্রাটের এক বিরাট বাহিনী জমায়েত হয়েছে সিরিয়া সীমান্তে। আরবের বিখ্যাত যোদ্ধা গোত্র গাসসান, লখম ও জুযাম গিয়ে মিশেছে ওদের সাথে। রোমান সম্রাটের ৪০ হাজার সৈন্য এদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে ছুটে আসছে। তাদের অগ্রবাহিনী আরব সীমান্তের 'বলকা' পর্যন্ত এসে গেছে।

রোম সম্রাটের এমন একটা মতিগতি যে আছে এবং আরবের কিছু গোত্রও যে তাদের উস্কানি দিয়ে চলেছে এ খবর মদীনায় ইতোপূর্বেও এসেছে। সুতরাং এ খবর পেয়েই মদীনায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু এ যুদ্ধযাত্রা ছিল বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অথচ অধিকাংশেরই সংগতি ছিল তখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় ঘোড়া, সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদিও তাদের ছিল না। মহানবী (সা) যুদ্ধ ফান্ডে যথাসাধ্য দান করার জন্য সকলের প্রতি

আহবান জানালেন। এ আহবানে সাড়া দিয়ে হযরত উসমান (রা) ৩শ’ উট দান করলেন, হযরত উমার ফারূক (রা) দান করলেন তাঁর সম্পদের অর্ধেক। আর হযরত আবুবকর (রা) দান করলেন তাঁর সব কিছু। এভাবে যাদের সাধ্য ছিল সবাই দান করলেন। কিন্তু সব প্রয়োজন তাতে পূরণ হলো না। অনেকের যুদ্ধযাত্রার সর্বনিম্ন প্রয়োজনও পুরণ হলো না। সুতরাং তাদেরকে তাবুক অভিযান থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত হলো।

যারা যুদ্ধযাত্রা থেকে বাদ পড়ল তাদের খুশী হবারই কথা। বিশেষ করে মুনাফিক ও ইহুদীরা অসহ্য গরমে অকল্পনীয় পথ চলার কষ্টের কথা বলে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলার গোপন প্রচেষ্টায় রত ছিল। সুতরাং আর্থিক অনটন ও অসহ্য গরমের মধ্যে পথ চলার কষ্টের কথা স্মরণ করে যুদ্ধে যোগ দানের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করায় তারা আনন্দিত হবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমানদের প্রকৃতিই আলাদা। তাই উল্টোটাই ঘটল। যারা যুদ্ধ যাত্রার লিষ্ট থেকে বাদ পড়ল, তারা এসে মহানবীর (সা) কাছে কেঁদে পড়ল। জিহাদে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে তারা কিছুতেই বঞ্চিত থাকতে চায় না। তাদেরই অন্যান্য ভাই যখন খোদাদ্রোহীদের সাথে মরণপণ সংগ্রামে রত থাকবে, তখন তারা গৃহকোণে নারীর মত বসে বসে সময় কাটাবে তা কিছুতেই হতে পারে না। তাদের জিহাদের ব্যাকুলতা দেখে স্বয়ং মহানবী (সা) অভিভূত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত কুরআনী আয়াত নাযিল হল তাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। কুরআনে ঘোষণা হল, “আর সেই লোকদের কোন গুণাহ নেই, যখন তারা তোমার কাছে এই উদ্দেশ্যে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলছ, “আমার কাছে তো কিছুই নেই, যার উপর তোমাদের আরোহন করাই,” তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় তাদের

চোখ থেকে অশ্রুর ধারা বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার কোন সম্বল নেই।"

আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত এমন মুসলমানরাই পূর্বআটলান্টিকের নীল জলরাশি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেছিল।

মহানবীর (সা) দূত মাথায় এক টুকরি মাটি নিয়ে ফিরলেন

পারস্য সম্রাট খসরু তখন সিংহাসনে সমাসীন। তাঁর প্রতাপে চারদিক প্রকম্পিত। ভান্ডারে তাঁর অফুরন্ত হীরা, জহরত, মনিমুক্তা। গর্বিত সম্রাট ভাবেন, তাঁর সাম্রাজ্য যেমন অজয় অক্ষয়, তেমনি তাঁর ধন-সম্পদের কোন শেষ নেই। এই সম্রাট খসরুর কাছেই গেলেন রাসূলুল্লাহর দূত। রাসূলের (সা) একটি পত্র ছিল তাঁর সাথে। পত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্রাট খসরুকে আহবান জানিয়েছিলেন সত্যের দিকে। সম্রাট খসরু মহানবীর সে চিঠি পাঠ করলেন। পাঠ করে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বললেন, "তোমাদের এত বড় স্পর্ধা। পারস্যের একচ্ছত্র অধিপতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাট খসরুর দরবারে ধর্ম কথা নিয়ে আসতে সাহস করেছো? তোমরা তো অত্যন্ত ঘৃণিত ও নীচ লোক।"

দূত সহাস্যে বললেন, "নিশ্চয়ই আমরা অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণিত ছিলাম। অতঃপর আমাদের মাঝে এলেন একজন মহামানব মহানবী। তিনি আমাদের সত্যের সন্ধান দিলেন। আমরা উন্নত হয়ে উঠলাম। আপনি যদি তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন, তবে আমরা ভাই ভাই। নচেৎ অসত্যের সাথে সত্যের দ্বন্দ্ব অনিবার্য।"

গর্বিত সম্রাট খসরু মহানবীর দূতের এই কথা শুনে বারুদের ন্যায় জ্বলে উঠলেন। বললেন, "ওহে কে আছ, এর মাথায় পারস্যের এক টুকরি মাটি উঠিয়ে দাও। সম্রাট খসরুর দরবারে এসে এমন ভালো লোক খালি হাতে ফিরে যাবে, তা বড়ই অশোভন।"

অবিলম্বে এক টুকরি মাটি এনে পারসিকেরা মহানবীর দূতের মাথায় চাপিয়ে দিল। সকৌতুকে সম্রাট খসরু বললেন, "যাও, এ ভাবেই তোমরা পারসিকদের দাসত্ব করবে।"

সাহাবা সে মাটির টুকরি আর মাথা থেকে নামালেন না। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পারস্য থেকে হিজাযে উপস্থিত হলেন। মাথায় টুকরি, পরিশ্রান্ত দেহ। কিন্তু মুখে প্রসন্ন হাসি। তিনি হাজির হলেন মহানবীর নিকট। বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি পারসিকদের নিজহাতে দেয়া মাটি মাথায় তুলে নিয়ে এসেছি।"

শুনে মহানবীর মুখমন্ডল স্বর্গীয় হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন তিনি, "উত্তম, ইনশায়াল্লাহ এটাই হবে। অচিরেই সে দেশের মাটি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে।"

মহানবীর এ ভবিষ্যতবাণী অতি অল্প দিনেই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবরূপ লাভ করলো। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য নিঃশেষে মুসলমানদের করতলগত হলো। আর সম্রাট খসরুর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী সম্রাট ইয়াজদগির্দ কপর্দকশূন্য কাংগাল সেজে রাজ-প্রাসাদ থেকে পথে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'একদিনে যিনি এতগুলো সৎ কাজ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবেন'

একদিন মহানবী (সা) তাঁর সামনে উপস্থিত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আজ রোযা রেখেছ?" হযরত আবুবকর (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি রোযা রেখেছি।" নবী (সা) আবার বললেন, "এমন কে আছ যে, আজ কোন শবাধারের সাথে গমন করে জানাযার নামায পড়েছ?" আবুবকর (র) বললেন, "এইমাত্র আমি একাজ সামাধা করে এখানে এসেছি।" মহানবীর (সা) কণ্ঠ থেকে আবার ঘোষিত হলো, "আচ্ছা এমন ব্যক্তি এখানে কে আছ যে আজ কোন পীড়িতের সেবা করেছ?" হযরত আবুবকর বললেন, "আজ আমি এক পীড়িত ব্যক্তির সেবা করেছি।" মহানবী (সা) আবারও বললেন, "আজ কিছু দান করেছ, এমন ব্যক্তি এই মজলিসে কেউ আছ?" সলজ্জভাবে হযরত আবুবকর উত্তরে বললেন, "এক অতিথিকে আমি সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করতে পেরেছি।" অবশেষে বিশ্ব নবী (সা) বললেন, "একদিনে যিনি এতগুলো সৎকাজ করেছেন নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।"

এই হাদীস শুনানোর পরবর্তীকালে হযরত উমার (রা) বলেছিলেন, "সত্যই জগতে এমন কোন উত্তম কাজ নেই, যা আবুবকর (রা) সর্বাগ্রে সুসম্পন্ন না করেন। এটা আমার অনুমান নয়, অভিজ্ঞতার কথা। একদিন আমি অশীতিপর এক বৃদ্ধার উপবাসের কথা শুনে কিছু খাবার নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু গিয়েই শুনলাম, কে একজন দয়ালু ব্যক্তি অল্পক্ষণ আগে আহার করিয়ে গেছেন। আমি সেদিন ফিরে এসে পরের দিন একইভাবে কিছু আহার নিয়ে তার কাছে গেলাম। কিন্তু একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম, কে একজন আমার যাওয়ার পূর্বেই তাকে আহার করিয়ে গেছে। কে এই দয়ালু ব্যক্তি, কে এমন নিয়ম বেঁধে তাকে আহার করিয়ে যায়, তা জানবার জন্য আমার জিদ চেপে গেল। পরের দিন সকাল সকাল আমি বৃদ্ধার বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। আমার আজকের শপথ, বৃদ্ধাকে আজ আমার আহার করাতেই হবে, সে ব্যক্তিকে আজ আমাকে দেখতেই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধার গৃহমধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম, শূণ্য বাসন পেয়ালা নিয়ে আবু বকর (রা) বের হয়ে আসছেন। আমি তাঁকে সালাম জানিয়ে বললাম, 'বন্ধুবর' আমিও এটাই অনুমান করেছিলাম। তিনি নীরব হাস্যে আমাকে প্রতিসালাম জানিয়ে করমর্দন করে বাড়ীর পথ ধরলেন।"

'আবুবকর পরবর্তী খলীফাদের বড় মুস্কিলে ফেলে গেলেন'

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রা) মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েছেন। খলীফা নির্বাচিত হবার ক' দিন পরের ঘটনা। নতুন চাদরের একটি বোঝা নিয়ে খলীফা বাজারে চলেছেন বিক্রি করার জন্য। উমার (রা) পড়লেন পথে। তিনি বললেন, "কোথায় চললেন?"

আবু বকর (রা) বললেন, "বাজারে যাচ্ছি"। হযরত উমার (রা) বুঝলেন, খলীফা হওয়ার আগে হযরত আবু বকর কাপড়ের যে ব্যবসা করতেন, তা এখনও ছাড়েননি। উমার বললেন, "ব্যবসায় মগ্ন থাকলে খিলাফাতের কাজ চলবে কেমন করে?"

হযরত আবু বকর বললেন, "ব্যবসা না করলে পরিবার-পরিজনদের ভরণ পোষণ করব কি দিয়ে?" উত্তরে হযরত উমার বললেন, "বাইতুল মালের খাজাঞ্চি আবু উবাইদার কাছে চলুন, তিনি আপনার জন্য একটা ভাতা নির্দিষ্ট করে দেবেন", বলে হযরত আবুবকরকে টেনে নিয়ে আবু উবাইদার কাছে গেলেন।

আলোচনার পর অন্যান্য মুহাজিরকে যে হারে ভাতা দেয়া হয় সে পরিমাণের একটি ভাতা খলীফা হযরত আবু বকরের জন্য নির্দিষ্ট হলো। ভাতা নির্দিষ্ট হবার পর খলীফা এ কথাটি জনসাধারণ্যে প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করলেন। তিনি মদীনায় সকল লোককে ডেকে বললেন, "তোমরা জান যে, ব্যবসা দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন তোমাদের খলীফা হবার ফলে

সারাটা দিনই খিলাফতের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, ব্যবসা দেখাশুনা করতে পারিনা। সেজন্য বাইতুল মাল থেকে আমাকে ভাতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।"

হযরত আবু বকর (রা) বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যেটুকু ভাতা গ্রহণ করতেন, জনসাধারণের কাছ থেকে এই ভাবে তা তিনি মঞ্জুর করিয়া নিলেন।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি হযরত আয়িশাকে (রা) বললেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার প্রয়োজনার্থে আনা বাইতুল মালের যাবতীয় জিনিস আমার পরবর্তী খলীফার নিকট পাঠিয়ে দিও।" তাঁর মৃত্যুর পর কোন টাকা পয়সাই তাঁর কাছে পাওয়া যায়নি। মাত্র একটি দুগ্ধবতী উট, একটি পেয়ালা, একটি চাদর ও একটি বিছানাই তাঁর সম্পদ ছিল। এ জিনিসগুলো মৃত খলীফার নির্দেশ মুতাবিক খলীফা উমারের (রা) কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এসব দেখে খলীফা উমার (রা) অশ্রুসজল চোখে বললেন, "আল্লাহ আবুবকরের উপর রহম করুন। তিনি তাঁর পরবর্তী খলীফাদের বড় মুস্কিলে ফেলে গেলেন।"

ভন্ড মহিলা নবী সাজাহ-এর মিত্র ও সাহায্যকারী মালিক ইবনে নুয়াইরা মুসলিম সেনাধ্যক্ষ খালিদের হাতে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হলেন। মালিক ইবনে নুয়াইরা যাকাত দেয়া বন্ধ করেছিল। অনেকের মতে মাগরিব ও ইশার নামায পড়াও বন্ধ করে দিয়েছিল সে। সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে হযরত খালিদ মালিককে সাহাবী হযরত যিরার ইবনে আওয়ারের দায়িত্বে সোপর্দ করেছিলেন। পরে সে নিহত হয়ে ছিল। এ খবর মদীনায় পৌঁছলে হযরত উমার (রা) হযরত যিরার ও হযরত খালিদের বিরুদ্ধে মালিক হত্যার অভিযোগ আনলেন। হযরত উমার (রা) পরিস্থিতিগত কারণে যাকাত অস্বীকারকারীদেরকেও সাময়িকভাবে মুসলমান বলে মনে করার পক্ষপাতি ছিলেন।। উমার ফারূক হযরত আবুবকরের কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন, "খালিদ মালিককে হত্যা করে কিতাবুল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।"

কিন্তু হযরত আবুবকর তাঁর সাথে একমত হলেন না। মুরতাদদের জন্য খলীফা হযরত আবু বকরের বিন্দুমাত্র দরদও ছিল না। মুরতাদদের প্রতি হযরত উমারের শৈথিল্য প্রস্তাবের উত্তরে খলিফা আবুবকর বলেছিলেন, "আমি নামায, যাকাত, প্রভৃতি কোন ফরয সম্বন্ধে সামান্যও শৈথিল্য প্রদর্শন করতে পারি না। আল্লাহর ফরয হিসেবে নামায ও যাকাতের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। আজ যাকাত সম্বন্ধে শৈথিল্য দেখালে কাল নামায রোযা সম্বন্ধেও কিছুটা

ঢিল দিতে হবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহকে (সা) যারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিত, আমি সেই মেষ শাবক পর্যন্ত লোকের ভয়ের খাতিরে বাদ দিতে পারব না। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা)হুকুমের সকল অবাধ্য লোককে অবনত করতে আমি একা হলেও যুদ্ধ করে যাব।"

হযরত উমার (রা) তখন খলীফা। খলীফা উমার (রা) এর বাড়ী থেকে বেশ কিছু দূরে একটি পানির কূপ। খলীফার সাক্ষাতপ্রার্থী একজন লোক দেখলেন, খলীফা কূপ থেকে পানি তুলছেন। শুধু পানি তোলা নয় আগন্তুক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলেন, পৃথিবীর শাসক উমার, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য পদানতকারী উমার (রা) সেই পানি ভরা কলসি কাঁধে তুলে নিলেন। আগন্তুক আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দ্রুত খলীফার নিকটে গেলেন। একজন অপরিচিত লোককে দেখে হযরত উমার (রা) বললেন, "ভাই, আপনার কি কোন কথা আছে, বলবেন আমাকে?"

লোকটি বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, যদি কলসটি দয়া করে আমার কাঁধে দিতেন।"

হযরত উমার (রা) যেতে যেতেই বললেন, "আমার ছেলে-মেয়ের খাদ্য পানীয় সংগ্রহের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয় করা কি আমার উচিত নয়? আচ্ছা, এ ছাড়া কি আপনি আর কিছু বলবেন?"

আগন্তুক লোকটি বললেন, "আপনার এই অবস্থায় বলার মত কোন কথা আমার মনে আসছেনা। আগে বাড়ী চলুন। তারপর বলব। আমি আপনাকে অপেক্ষা করতে বলব, আপনি কাঁধে বোঝা নিয়ে আমার কথা শুনবেন, এটা হতে পারে না।"

আগন্তুকের কথা শুনে হযরত উমার থমকে দাঁড়ালেন। বোধ হয় ভাবলেন, 'আমি আমার নিজের কাজ করছি, এ কাজের অজুহাতে

আগন্তুককে দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হবে না।' তিনি কাঁধ থেকে কলসি নামিয়ে জানুর উপর রাখলেন। তার পর বললেন, "বলুন, আপনার কথা।"

আগন্তুক ভীষণ বিব্রত বোধ করলেন। তার কথা শুনার জন্য আমীরাল মুমিনীন এ ভাবে কষ্ট করবেন। কলসটি মাটিতে নামিয়ে রাখলে তবু কিছুটা কষ্টের লাঘব হয় তাঁর। তিনি খলীফাকে নিবেদন করলেন, "জানুর উপর কলস রেখে কথা শুনতে আপনার কষ্ট হবে। কলসটি দয়া করে মাটিতে রাখুন।"

খলীফা বললেন, "তা কি করে হয় ভাই? কলসির তলা ভিজা। এ জমিটি আমার নয়। ভিজা কলসির তলায় লেগে অন্যের জমি আমার বাড়িতে চলে গেলে, আকি কি জওয়াবদিহি করব?"

লোকটি বলল, "আমার জিজ্ঞাসার জবাব আমি পেয়ে গেছি, আপনি দয়া করে যান।"

উমার (রা) বললেন, "বুঝলাম না, বুঝিয়ে বলুন।"

লোকটি বলল, "ইয়া আমীরাল মুমিনীন, আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম বর্তমান জরীপে অন্যের জমির কতকাংশ আমার জমির সাথে উঠে এসেছে। তা আমার জন্য হালাল কিনা?"

উমারের (রা) ভাতা বৃদ্ধির চেষ্টা

উমারের (রা) খিলাফত। খলীফা হওয়ার পূর্বে উমার ব্যবসা করে পরিবার চালাতেন। যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন জনসাধারণের ধনাগার (বাইতুলমাল) থেকে অতি সাধারণভাবে জীনব ধারণের উপযুক্ত অর্থ তাঁকে ও তাঁর পরিবারের জন্য দেয়া হলো। বছরে মাত্র দু' প্রস্থ পোশাক। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের শক্তি যাঁর কাছে নত, সেই দোর্দন্ড প্রতাপ খলীফা উমার সামান্য অর্থ পান জীবনধারণের জন্য।

হযরত আলী, উসমান ও তালহা ঠিক করলেন খলীফার এই মাসোহারা যথোপযুক্ত নয়, আরও কিছু অর্থ বাড়িয়ে দেয়া হোক। কিন্তু কে এই প্রস্তাব খলীফা উমারের কাছে পেশ করবে। অবশেষে উমারের কন্যা ও রাসূলের (সা) স্ত্রী হাফসাকে (রা) তাঁর কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। হাফসা (রা) পিতার নিকট এই প্রস্তাব তুলতেই খলীফা উমার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। রুক্ষস্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কারা এই প্রস্তাব করেছে?" হাফসা নিরুত্তর। পিতাকে তিনি কি উত্তর দেবেন? সাহস হলোনা। খলীফা বললেন, "যদি জানতাম কারা এই প্রস্তাব তোমার মারফতে পাঠিয়েছে। তবে তাদের পিটিয়ে আমি নীল করে দিতাম। বেটি, তুমিতো জান, কি পোশাক রাসূল (সা) পরিধান করতেন, কিরূপ খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন, কি শয্যায় তিনি শয়ন করতেন। বলত, আমার পোশাক, আমায় খাদ্য, আমার শয্যা কি তার চাইতে নিকৃষ্ট?"

হাফসা উত্তর দিলেন, "না"। খলীফা বললেন, "তবে যারা এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে, তাদের বলো, আমাদের নবী জীবনের যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা থেকে আমি এক চুলও বিচ্যুত হবো না।" সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে-- ।

সহজ অনাড়ম্বর ও নিঃস্বার্থ জীবন যাপন সত্যিকার মানুষের আদর্শ---সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত যার জীবন নয়, সে কি করে শহীদের রক্তাক্ষরে লেখা সত্যের জীবনকে গ্রহণ করবে? খলীফা উমারও এক দিন আততায়ীর হস্তে নিহত হন। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে চলেছিলেন এই তাঁর অপরাধ। খলীফা উমার শহীদ হয়েছেন কবে, কিন্তু সত্যের নির্ভীক সাধক শহীদ উমার আজও বেঁচে আছেন দেশ ও জাতির দিগদর্শনরূপে।

উমারের (রা) ছেলের কান্না

মক্তব থেকে এসে খলীফা উমারের ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হযরত উমার তাকে কাছে টেনে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁদছো কোন বৎস?"

ছেলে উত্তর দিল, "সবাই আমাকে টিটকারী দেয়।" বলে, "দেখনা জামার ছিরি, চৌদ্দ জায়গায় তালি। বাপ নাকি আবার মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা।" বলে ছেলেটি তার কান্নার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।

ছেলের কথা শুনে হরত উমার ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বাইতুল মা'লের কোষাধ্যক্ষকে লিখে পাঠালেন, "আমাকে আগামী মাসের ভাতা থেকে চার দিরহাম ধার দেবেন।" উত্তরে কোষাধ্যক্ষ তাঁকে লিখে জানালেন, "আপনি ধার নিতে পারেন। কিন্তু কাল যদি আপনি মরে যান তাহলে কে আপনার ধার শোধবে?"

হযরত উমার ছেলের গা-মাথা নেড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "যাও বাবা, যা আছে তা পরেই মক্তবে যাবে। আমাদের তো আর অনেক টাকা পয়সা নেই। আমি খলীফা সত্য, কিন্তু ধন সম্পদ তো সবই জনসাধারণের।"

উসমান (রা) কিভাবে খলীফা হলেন

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারূকের শাহাদাত প্রাপ্তির পর খলীফা নির্বাচন নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। শাহাদাতের পূর্বে হযরত উমারকে (রা) ভাবি খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হযরত উমার (রা) কোন বিশেষ একজনের নাম না করে হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা), হযরত সা'দ (রা), হরত তালহা (রা) ও হযরত যুবাইর (রা) এ ছয় জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন সভায় তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করতে গিয়ে বিভিন্ন মত এমনকি ছয় জনকে নিয়ে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগেরই সৃষ্টি হয়ে গেল। আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। অবশেষে যুবাইর বললেন, 'আমি হযরত আলীর স্বপক্ষে আমার দাবী পরিত্যাগ করলাম'। হযরত তালহা দাঁড়িয়ে বললেন, 'খিলাফাতের দায়িত্ব মাথায় নিতে আমি একেবারে অক্ষম। সুতরাং আমার দাবী আমি হযরত উসমান গনির (রা) উপর অর্পন করলাম।' হযরত সা'দ (রা) দন্ডায়মান হয়ে বললেন, 'আমার মতে খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তি হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ। সুতরাং আমি আমার দাবী পরিত্যাগ করে হযরত আব্দুর রহামন ইবন আউফকে সমর্থন করছি।"

অতপর সমস্যা ছয় থেকে তিনে এসে দাঁড়াল। সেদিনকার মত সভা ভেঙে গেল। মীমাংসা হলোনা। বাড়ী গিয়ে হযরত আব্দুল রহামান ইবন আউফ চিন্তা করলেন, হযরত আলী ও হযরত

উসমানের মতো যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে খিলাফত পদ আমার জন্য সাজে না। বিষয়টা চিন্তা করেই হযরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ হযরত আলীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমি আদৌ খলীফা হতে চাইনে, আর এইভাবে খলীফাহীন অবস্থায় মুসলিম জাহান একদিনও থাকা উচিত নয়। এজন্য আমি চাই, সত্বরই একটি সভা আহবান করে আপনাকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করি। সম্মান ও সম্পদের প্রতি চির বীতশ্রদ্ধ হযরত আলী বললেন, "উত্তম, আমিও খলীফা নির্বাচন ব্যাপারে বিলম্ব পছন্দ করিনা। আর খিলাফতের দায়িত্বকে গুরুতর বোঝা মনে করি। অতপর আসুন কালই আমরা হযরত উসমানকে (রা) খলীফা পদে বরণ করি।' হযরত আলীর প্রস্তাব অনুসারেই কাজ হলো। পরবর্তী দিনের সভায় হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন।

সেনাপতি সা'দ। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক সা'দ পারস্য জয় করেছেন। বিজয়ের পর হযরত উমার তাঁকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সেনাপতি সা'দ তাঁর বিজয় অভিযান কালে পারস্য সম্রাটের বিলাসব্যসন ও আরাম আয়েশের অফুরান নজীর দেখেছেন। কুফা নগরী সাজাবার সময় বোধ হয় তাঁর সেসব কথা মনে পড়েছিল। তিনি নিজের জন্যও তাই সেখানে একটি প্রাসাদ তৈরী করলেন এবং সম্রাট খসরুর প্রাসাদের একটি তোরণ এনে তাঁর প্রাসাদে সংযুক্ত করলেন। বোধ হয় বিজেতা সা'দের মনে আয়েশের কিঞ্চিত আমেজ এসে বাসা বেঁধেছিল। এনিষ্কলুষ ভোগ তাঁর কাছে কোন খারাপ বিষয় বলেও বোধ হয়নি।

কিন্তু খবরটা খলীফা উমারের কাছে পৌছতেই তিনি বারুদের মত জ্বলে উঠলেন। সেনাপতি সা'দের মতি বিভ্রম ঘটেছে কিনা তিনি ভেবে পেলেন না। হযরত উমার (রা) ত্বরিত একজন দূতকে সা'দের নামে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, "শোন, পৌঁছেই তুমি সা'দের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেবে। সা'দ তোমাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেই তাকে এ চিঠিখানা দেবে।" দূত ছুটল কুফার দিকে। হযরত উমারের যা নির্দেশ ছিল, তাই করল সে। সা'দের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলো। স্তম্ভিত সা'দ খলীফার দূতের এই কান্ড দেখে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। দূত বিনা বাক্য ব্যয়ে খলীফার চিঠি তাঁর হাতে তুলে দিল। সা'দ চিঠিটি তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরলেন। তাতে লিখা ছিলঃ "শুনতে পেলাম, নিজের আরাম-

আয়েশের জন্য খসরুর প্রাসাদের মত তুমি এক প্রাসাদ গড়েছো। শুনেছি, খসরুর প্রাসাদের একটি কবাটও এনে তোমার প্রাসাদে লাগিয়েছ। দারোয়ান, সিপাইও রেখেছ। এতে প্রজাদের অভাব অভিযোগ জানাতে অসুবিধা হবে। তা বোধ হয় তুমি নিশ্চয়ই ভাবনি। নবীর পথ পরিত্যাগ করে খসরুর পথ ধরেছো। ভুলোনা, প্রাসাদে বাস করেও খসরুদের দেহ কবরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর নবী সামান্য কুটিরে বাস করেও সর্বোচ্চ জান্নাতে উন্নীত হয়েছেন। মাসলামাকে তোমার প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলবার জন্য পাঠালাম। বাস করার জন্য একটি কুটির এবং একটি খাজাঞ্চি খানাই যথেষ্ট।" সা'দ নত মস্তকে, অশ্রুসিক্ত নয়নে খলীফার নির্দেশ মেনে নিলেন।

জর্দানের রোমান শাসকের দরবারে মুয়াজ

জর্দানের সুন্দর 'ফাহল' নগরী। ইরাক-জর্দান এলাকায় এটা রোমানদের শেষ দুর্গ। নিরুপায় রোমক বাহিনী মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদার কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিল। সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সেনাপতি আবু উবাইদাহ মুয়াজ ইবন জাবালকে পাঠালেন রোমক শাসক সাকলাবের দরবারে।

মুয়াজ দরবারে পৌঁছলে সাকলাব তাঁকে পরম সমাদরে একটি কারুকার্যখচিত আসনে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন।

কিন্তু মুয়াজ দরবারের মাটির আসনেই বসে পড়লেন। সাকলাব বললেন, "আমরা আপনাকে মর্যাদা দিতে চাই, কিন্তু নিজেই আপনি আপনার সম্মান নষ্ট করেছেন।"

মুয়াজ বললেন, "যে আসন দরিদ্র প্রজাদের বক্ষরক্তে চারু চিত্রের রূপ ধারণ করেছে, সে আসনকে আমরা ঘৃণা করি।" সাকলাব বললেন, "এই আসন দরিদ্র প্রজাদের অর্থে নির্মিত তা আপনি কেমন করে বুঝলেন?"

মুয়াজ বললেন, "আপনার জৌলুসপূর্ণ বেশভূষা আর আপনার সৈন্যদের বেশ দেখেই এটা আমি বুঝেছি।"

রোমান শাসক সাকলাব বললেন, "আপনাদের উর্ধতন কর্মচারী ও আপনাদের প্রভুও কি এরূপ আসনে বসেন না?"

মুয়াজ বললেন, "না, আমীরুল মুমিনীনও এরূপ আসনে উপবিষ্ট হন না। আমাদের প্রভুর কথা বলছেন? একমাত্র আল্লাহ

ব্যতীত আমরা কাকেও প্রভু বলে সম্বোধন করি না। আমরা নিজেকে কখনও কোন মানবের দাস বলে ভাবি না। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব চালিয়ে যাওয়াকে আমরা মানব ধর্মের বহির্ভূত কাজ বলে মনে করি।"

রোমান শাসকের চোখ দু'টিতে নিঃসীম বিস্ময় ঝরে পড়ল। একটু সময় নিয়ে তিনি বললেন, "আপনারা যদি এমন ন্যায় নিষ্ঠ, তাহলে পররাজ্য অধিকারে আসেন কেন?" মুয়াজ বললেন, "আমরা পররাজ্য অধিকার করি ঠিক, কিন্তু কোন ন্যায় পরায়ণ ও সত্য নিষ্ঠের রাজ্য আমরা দখল করি না। দখল করি আপনাদের মত স্বার্থপরের রাজ্য। তারপর সেখানকার মৃত প্রায় মানুষকে নতুন জীবন দান করি–প্রত্যেকটি মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার জন্য উদ্বুদ্ধ করি।"

সর্বশেষে সাকলাব বললেন, "আমরা আপনাদেরকে বালকা জিলাসহ জর্দানের কিয়দংশ দিয়ে দেব, আপনারা আমাদের সাথে সন্ধি করুন।" মুয়াজ বললেন, "না আমরা ধন বা রাজ্যলোভে যুদ্ধ করি না। আমরা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধর্ম প্রচার করি। হয় আপনারা ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করুন, নতুবা জিযিয়া দিন। এ দু'টির কোনটিই গৃহীত না হলে যুদ্ধ অনিবার্য।"

দুর্বিনীত রোমক শাসক যুদ্ধের পথই অনুসরণ করল। কিন্তু যুদ্ধ ডেকে আনল তার জন্য চরম পরাজয়। আর মুসলমানদের হাতে তুলে দিল ফাহল, বেসান, আম্মান, জিরাশ, মায়াব প্রভৃতি নগরীসহ গোটা জর্দান প্রদেশ।

আমীরুল মুমিনীন কৈফিয়ত দিলেন

শুক্রবার। জুমার নামায। ইমামের আসনে হযরত উমার। খোতবাদানের জন্য তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়েছেন। চারদিকে নিঃসীম নীরবতা। সকলের চোখ খলীফা উমারের দিকে। হঠাৎ মসজিদের অভ্যন্তর থেকেএকজন লোক উঠে দাঁড়াল। সে বলল, "উপস্থিত ভ্রাতৃগণ! গতকাল আমরা বাইতুল মাল থেকে এক টুকরা করে কাপড় পেয়েছি। কিন্তু খলীফা আজ যে নতুন জামাটি গায়ে দিয়েছেন, তা তৈরী করতে অন্ততঃ তিন টুকরা কাপড়ের প্রয়োজন। তিনি আমাদের খলীফা, এই জন্যই কি আরও টুকরা কাপড় বেশী নিয়েছেন?"

খলীফার পুত্র দাঁড়িয়ে বললেন,"আববাজানের পুরানো জামাখানা গায়ে দেয়ার অযোগ্য হয়ে গেছে। এজন্য আমার অংশের টুকরাটি আববাজানকে দিয়েছি।"

এরপর খলীফার চাকর উঠে বলল, "আমার টুকরাটিও অনেক সাধা-সাধি করে খলীফাকে দিয়েছি। তাই দিয়েই জামা তৈরী হয়েছে।"

এই বার খলীফা সেই জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিকে কৃত্রিম রোষে বললেন, "দেখুন সাহেব, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন?"

লোকটি বলল, "নিশ্চয়ই আমি বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসক আমীরুল মুমিনীন সম্বন্ধে অভিযোগ করেছি।"

খলীফা পুনরায় বললেন, "আচ্ছা সত্যই যদি আমি এমন কাজ করতাম, আপনি কি করতেন?"

খলীফার কথা শেষ হবার সংগে সংগেই লোকটি সরোষে বলল, "তরবারি দিয়ে আপনার মস্তক দুইখন্ড করে ফেলতাম।"

লোকটির এ ধৃষ্টতা দর্শনে জামাতের সকলেরই মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। কিন্তু খলীফা হাত উঠিয়ে হাসি ও খুশী ভরা গদগদ কণ্ঠে মুনাজাত করলেন, "ইয়া আল্লাহ্, আপনার শুকরিয়া যে, আপনার প্রিয় নবীর বিধান রক্ষার্থে নামাযের জামাতে বসেও এমন বিশ্ব ভীতি উমারকে তলোয়ার দেখাবার মুসলমানের অভাব নেই।"

শুক্রবার। জুমআর নামায পড়তে খলীফা মসজিদে গেছেন। সামনে পিছনে তালি দেয়া একটি কামিছ তাঁর গায়ে। একজন অনুযোগ করে বলল, "আল্লাহ আপনাকে প্রচুর দিয়েছেন, আপনি অন্ততঃ একটু ভালভাবে পোষাক পরিধান করুন।" খলীফা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "প্রাচুর্যের মধ্যে সংযম পালন ও শক্তিমানের পক্ষে ক্ষমা প্রদর্শন অতীব প্রশংসনীয়।" উৎসর্গীকৃত জীবন যাদের, আড়ম্বর-বিলাস, সুখাদ্য গ্রহণ, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য দেয়ার সময় তাদের কোথায়?

হজ্জ করবার সময় ভিড়ের মধ্যে আরবের পার্শ্ববর্তী এক রাজার চাদর এক দাসের পায়ে জড়িয়ে যায়। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা জাবালা সেই দাসের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। লোকটি খলীফা উমারের (রা) নিকট সুবিচার প্রার্থনা করে নালিশ করে। জাবালাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হলো। অভিযোগ সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করায় জাবালা রূঢ় ভাষায় উত্তর দিলেন, "অভিযোগ সত্য। এই লোকটি আমার চাদর মাড়িয়ে যায় কাবা ঘরের চত্বরে।"

"কিন্তু কাজটি তার ইচ্ছাকৃত নয়, ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে"–রুক্ষ স্বরে বাধা দিয়ে বললেন খলীফা। উদ্ধত ভাবে জাবালা বললেন, "তাতে কিছু আসে যায় না–এ মাসটা যদি পবিত্র হজ্জের মাস না হতো তবে আমি লোকটিকে মেরেই ফেলতাম।" জাবালা ছিলেন ইসলামী সাম্রাজ্যের একজন শক্তিশালী মিত্র ও খলীফার ব্যক্তিগত বন্ধু।

খলীফা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর অতি শান্ত ও দৃঢ় স্বরে বললেন, "জাবালা, তুমি তোমার দোষ স্বীকার করেছ। ফরিয়াদী যদি তোমাকে ক্ষমা না করে তবে আইনানুসারে চড়ের পরিবর্তে সে তোমাকে চড় লাগাবে।"

গর্বিত সুরে উত্তর দিলেন জাবালা, "কিন্তু আমি যে রাজা আর ও যে একজন দাস।" উত্তরে উমার বললেন, "তোমরা দু'জনেই মুসলমান এবং আল্লাহর চোখে দু'জনেই সমান।"

গর্বিত রাজার অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। গর্ব অহংকার মদমত্ততা মানুষের ধর্ম নয়। সে নির্ভীক, নির্বিকার ও নির্মম। কিন্তু শান্ত সংযত ও সুন্দর সে। সত্যের বাণী যারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন, মানব গোষ্ঠীর প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ অসীম। মানুষের সেবা সৃষ্ট জীবের সেবা করেই তাঁরা এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন। মানব সেবার এই গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করে খলীফা উমারের আর স্বস্তি নেই। কর্তব্যের যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, যদি তাঁর তিলমাত্র অবহেলায় কেউ কষ্ট পায়, তবে আল্লাহর কাছে যে তার প্রত্যেকটির জন্য জবাব দিহি করতে হবে। তাই উমারের (রা) চোখে ঘুম নেই। রাতের অন্ধকারে তিনি ঘুরে বেড়ান। কে কোথায় কি করছে, কে রোগ যন্ত্রণায় বা ক্ষুধায় কাঁদছে, কে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অন্ধকারে, কে শোকে মুহ্যমান হয়ে আর্তনাদ করছে। তা তিনি খুঁটে খুঁটে দেখেন। আল্লাহ নেতৃত্ব যার হাতে দেন, তিনি আসলে জন সেবক। তাঁর অসীম বেদনা বোধ, বিপুল দায়িত্বভার তার। এই বেদনা ও দায়িত্বভারেই খলীফা উমার অস্থির থাকতেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও নিঝুম নিশীথে স্বীয় দায়িত্বের কথা স্মরণ করে উমার (রা) অঝোরে কাঁদতেন।

উত্তোলিত তলোয়ার কোষবদ্ধ হলো

যুদ্ধের এক ময়দান। মুসলমানদের সাথে কাফিরদের ভীষণ যুদ্ধ চলছে। হযরত আলী (রা) জনৈক বিপুল বলশালী শত্রুর সাথে যুদ্ধে মত্ত রয়েছেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর তাকে কাবু করে ভূপাতিত করলেন এবং তাকে আঘাত হানার জন্য তাঁর জুলফিকার উর্ধে উত্তোলন করলেন। কিন্তু আঘাত হানার আগেই ভূপাতিত শত্রুটি তাঁর চেহারা মুবারকে থুথু নিক্ষেপ করলো। ক্রোধে হযরত আলীর চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। মনে হলো, এই বুঝি তাঁর তরবারি শতগুণ বেশী শক্তি নিয়ে শত্রুকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে। কিন্তু তা হলো না। যে তরবারিটি আঘাত হানার জন্য উর্ধে উত্তোলিত হয়েছিল এবং যা বিদ্যুৎ গতিতে শত্রুর দেহ লক্ষ্যে ছুটে যাচ্ছিল, তা থেমে গেল। শুধু থেমে গেল নয়, ধীরে ধীরে তা নীচে নেমে এল। পানি যেমন আগুনকে শীতল করে দেয়, তেমনিভাবে আলীর ক্রোধে লাল হয়ে যাওয়া মুখমন্ডলও শান্ত হয়ে পড়ল।

হযরত আলীর এই আচরণে শত্রুটি বিস্ময় বিমূঢ়। যে তরবারি এসে তার দেহকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলার কথা, তা আবার কোষবদ্ধ হলো কোন কারণে? বিস্ময়ের ঘোরে শত্রুর মুখ থেকে কিছুক্ষণ কথা সরল না। এমন ঘটনা সে দেখেনি, শোনেওনি কোনদিন। ধীরে ধীরে শত্রুটি মুখ খুলল। বলল, "আমার মতো মহাশত্রুকে তরবারির নীচে পেয়েও তরবারি কোষবদ্ধ করলেন কেন?"

হযরত আলী বললেন, "আমরা নিজের জন্য কিংবা নিজের কোন খেয়াল খুশী চরিতার্থের জন্য যুদ্ধ করিনা। আমরা আল্লাহর

পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করি। কিন্তু আপনি যখন আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলেন তখন প্রতিশোধ গ্রহণের ক্রোধ আমার কাছে বড় হয়ে উঠল। এ অবস্থায় আপনাকে হত্যা করলে সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হতোনা। বরং তা আমার প্রতিশোধ গ্রহণ হতো। আমি আমার জন্য হত্যা করতে চাইনি বলেই উত্তোলিত তরবারি ফিরিয়ে নিয়েছি। ব্যক্তিস্বার্থ এসে আমাকে জিহাদের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করুক, তা আমি চাইনা।"

শত্রু বলল, "আমিদূর থেকে এতদিন আপনাদের উদারতা, মহানুভবতা ও সত্যনিষ্ঠার কথা শুনেছি, আজ তা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।"

শত্রুটি ভূমি শয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সংগে সংগে তাওবাহ করে ইসলাম কবুল করল। এমন অদম্য অতুল্য বীরের ক্ষুদ্ধ হৃদয়েও এত বেশী ক্ষমা এবং স্বস্তি গুণ বিদ্যমান থাকে, এত বড় যোদ্ধা চরম মুহূর্তেও এমন ভীষণ শত্রুকে এতটুকু কর্তব্য বোধে ছেড়ে দিতে পারেন, এত বড় জিতেন্দ্রীয় এত বড় ক্ষমাশীলের ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি—একথা শত্রু অকুণ্ঠ চিত্তেই স্বীকার করে নিল।

'ধন্য সেই বিধান যা খলীফাকে পর্যন্ত খাতির করেনা'

৬৫৮ সাল। হযরত আলী (রা) খলীফার আসনে। তাঁর ঢাল চুরি গেল। চুরি করল একজন ইহুদী। খলীফা আলী কাযীর কাছে বিচার প্রার্থী হলেন। কাযী আহ্বান করলেন দু'পক্ষকেই। ইহুদী খলীফার অভিযোগ অস্বীকার করলো। কাযী খলীফার কাছে সাক্ষী চাইলেন। খলীফা হাজির করলেন তাঁর এক ছেলে এবং এক চাকরকে। কিন্তু আইনের চোখে এ ধরনের সাক্ষী অচল। কাযী খলীফার অভিযোগ নাকচ করে দিলেন।

মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও কোন বিশেষ বিবেচনা তিনি পেলেন না। ইসলামী আইনের চোখে শত্রুমিত্র সব সমান।

ইহুদী বিচার দেখে অবাক হলো। অবাক বিস্ময়ে সে বলে উঠলো, "অপূর্ব এই বিচার, ধন্য সেই বিধান যা খলীফাকে পর্যন্ত খাতির করে না, আর ধন্য সেই নবী যার প্রেরণায় এরূপ মহৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনের সৃষ্টি হতে পারে। হে খলীফাতুল মুসলিমীন, ঢালটি সত্যই আপনার। আমিই তা চুরি করেছিলাম। এই নিন আপনার ঢাল। শুধু ঢাল নয়, তার সাথে আমার জানমাল-আমার সব কিছু ইসলামের খেদমতে পেশ করলাম।" সত্য তার আপন মহিমায় এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে।

অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা ও এক হাজার দিনার

হযরত উসমানের (রা) শাসন কাল। নীল ভূমধ্যসাগর তীরের তারাবেলাস নগরী। পরাক্রমশালী রাজা জার্জিসের প্রধান নগরী এটা। এই পরাক্রমশালী রাজা ১লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবন সাদে'র নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। স্বয়ং রাজা জার্জিস তাঁর বাহিনীর পরিচালনা করছেন। পাশে রয়েছে তাঁর মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী তাঁর সে মেয়ে।

যুদ্ধ শুরু হল। জার্জিস মনে করেছিলেন তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী এবার মুসলিম বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু তা হল না। মুসলিম বাহিনীর পাল্টা আঘাতে জার্জিস বাহিনীর ব্যূহ ভেংগে পড়ল। উপায়ান্তর না দেখে তিনি সেনা ও সেনানীদের উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা করলেন, "যে বীর পুরুষ মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহর ছিন্ন শির এনে দিতে পারবে, আমার কুমারী কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ করবো।"

জার্জিসের এই ঘোষণা তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে উৎসাহের এক তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করল। তাদের আক্রমণ ও সমাবেশে নতুন উদ্যোগ ও নতুন প্রাণাবেগ পরিলক্ষিত হলো। জার্জিসের সুন্দরী কন্যা লাভের উদগ্র কামনায় তারা যেন মরিয়া হয়ে উঠল। তাদের উন্মাদ আক্রমণে মুসলিম রক্ষা ব্যূহে ফাটল দেখা দিল। মহানবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবা হযরত যুবাইরও সে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সেনাপতি সাদকে পরামর্শ দিলেন, "আপনিও ঘোষণা করুন, যে তারা বেলাসের শাসনকর্তা জার্জিসের ছিন্নমুন্ড এনে দিতে পারবে, তাকে সুন্দরী জার্জিস দুহিতাসহ এক হাজার দিনার বখশিশ দেব।" যুবাইরের পরামর্শ অনুসারে সেনাপতি সা'দ এই কথাই ঘোষণা করে দিলেন।

তারাবেলাসের প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে জার্জিস পরাজিত হলেন। তাঁর কর্তিত শিরসহ জার্জিস কন্যাকে বন্দী করে মুসলিম শিবিরে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু এই অসীম সাহসিকতার কাজ কে করল? এই বীরত্বের কাজ কার দ্বারা সাধিত হলো? যুদ্ধের পর মুসলিম শিবিরে সভা আহূত হলো। হাজির করা হলো জার্জিস-দুহিতাকে। সেনাপতি সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি জার্জিসকে নিহত করেছেন, তিনি আসুন। আমার প্রতিশ্রুত উপহার তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছি।"

কিন্তু গোটা মুসলিম বাহিনী নীরব নিস্তব্ধ। কেউ কথা বলল না, কেউ দাবী নিয়ে এগুলোনা। সেনাপতি সা'দ বার বার আহবান জানিয়েও ব্যর্থ হলেন। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলেন জার্জিস দুহিতা। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর পিতৃহন্তাকে। কিন্তু তিনি দাবী নিয়ে আসছেন না কেন? টাকার লোভ, সুন্দরী কুমারীর মোহ তিনি উপেক্ষা করছেন? এত বড় স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে জগতের ইতিহাসে এমন জিতেন্দ্রীয় যোদ্ধা-জাতির নাম তো কখনও শুনেননি তিনি। পিতৃহত্যার প্রতি তাঁর যে ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল, তা যেন মুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। অপরিচিত এক অনুরাগ এসে সেখানে স্থান করে নিল।

অবশেষে সেনাপতির আদেশে জার্জিস দুহিতাই যুবাইরকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, "ইনিই আমার পিতৃহন্তা, ইনিই আপনার জিজ্ঞাসিত মহান বীর পুরুষ।" সেনাপতি সা'দ যুবাইরকে অনুরোধ করলেন তাঁর ঘোষিত উপহার গ্রহণ করার জন্য।

যুবাইর উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে বললেন, "জাগতিক কোন লাভের আশায় আমি যুদ্ধ করিনি। যদি কোন পুরস্কার আমার প্রাপ্য হয় তাহলে আমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

মূর্তির নাকের বদলে মানুষের নাক

একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টান পল্লীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। কে একজন গত রাত্রে যীশু খ্রীষ্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রীষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ধরে নিল তারা যে, এটা একজন মুসলমানেরই কাজ। খ্রীষ্টান নেতারা মুসলিম সেনাপতি আমরের কাছে এলো বিচার ও অন্যায় কাজের প্রতিশোধ দাবী করতে। আমর সব শুনলেন। শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরী করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্যরূপ। তাদের সংকল্প প্রকাশ করে একজন খ্রীষ্টান নেতা বললো, "যীশুখ্রীষ্টকে আমরা আল্লাহর পুত্র বলে মনে করি। তাঁর প্রতিমূর্তির এরূপ অপমান হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। অর্থ এর যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ নয়। আমরা চাই আপনাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে ঠিক অমনি ভাবে তার অসম্মান করি।" এ কথা শুনে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন আমর। ভীষণ ক্রোধে মুখমন্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি খ্রীষ্টান বিশপকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি। আমাদের যে কোন একজনের নাক কেটে আমি আপনাদের দিতে প্রস্তুত, যার নাক আপনারা চান।" খ্রীষ্টান নেতারাও সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। পরদিন খৃষ্টান ও মুসলমান বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। মিসরের শাসক সেনাপতি আমর সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন,

"এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাসিকা ছেদন করুন।"

এই কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্মধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রীষ্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সে নীরবতায় নিঃশ্বাসের শব্দ করতেও যেন ভয় হয়। সহসা সেই নীরবতা ভংগ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বলল, "আমিই দোষী---সিপাহসালারের কোন অপরাধ নেই। আমিই মূর্তির নাসিকা কর্তন করেছি, এই তা আমার হাতেই আছে!" সৈন্যটি এগিয়ে এসে বিশপের তরবারির নীচে নিজের নাসিকা পেতে দিল। স্তম্ভিত বিশপ। নির্বাক সকলে। বিশপের অন্তরাত্মা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশপ বললেন, "ধন্য সেনাপতি, ধন্য এই বীর সৈনিক, আর ধন্য আপনাদের মুহাম্মাদ যাঁর মহান আদর্শে আপনাদের মত মহৎ, উদার, নির্ভীক ও শক্তিমান ব্যক্তি গড়ে উঠেছে। যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অসম্মান করা অন্যায় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও অন্যায় হবে যদি আজ আমি এই সুন্দর ও জীবন্ত দেহের অঙ্গহানি করি। সেই মহান ও আদর্শ নবীকেও আমার সালাম জানাই।"

শত্রুকে নিজের তরবারি দান

চতুর্থ খলীফা বীরবর আলী। বিস্ময়কর তাঁর শক্তি, সাহস ও ঔদার্য। এক যুদ্ধের ময়দানে বিপুল বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করছেন। একজন বলিষ্ঠ ও সাহসী সৈন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে প্রচন্ড বেগে তাঁকে আক্রমণ করল। তুমুল যুদ্ধ চললো। অকস্মাৎ আলীর আঘাতে শত্রুর তরবারী ভেঙ্গে গেল। শত্রুকে অসহায় দেখে আলী তরবারি কোষ বদ্ধ করলেন। শত্রু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আলীকে ক্ষান্ত হতে দেখে সে বিস্মিত হলো। সে আলীর কাছে আর একখানি তরবারি চাইতেই আলী তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের তরবারি খানি তাকে দিয়ে দিলেন। শত্রু অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। এভাবে আপনাকে অরক্ষিত করে যে বীর অন্যের প্রার্থনা পূর্ণ করে, তাঁর সঙ্গে তো যুদ্ধ অসম্ভব। শত্রু জিজ্ঞাসা করলো, "হে বীর শ্রেষ্ঠ আলী, আপনি কেন এভাবে নিজেকে বিপদের মুখে ফেলে আপনার তরবারি দান করলেন?" আলী উত্তর দিলেন, "কিন্তু আমি যে কারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিনে।" শত্রু অম্লান বদনে আলীর এই মহত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। সত্যের কাছে অসত্য এমনিভাবে পরাজয় স্বীকার করেছে–যুগে যুগে। সত্যের মহিমা মিথ্যার গর্বকে জয় করেছে।

সত্য–ন্যায়ের শক্তি পশুত্বকে জয় করেছে, অস্ত্রের চাকচিক্য, মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে ম্লান করেছে–উপেক্ষা করেছে।

উবাদা ইবনে সামিতের শপথ রক্ষা

খলীফা উমার (রা) এর শাসনকাল। মুয়াবিয়া তখন সিরিয়ার শাসনকর্তা। মদীনার খাযরাজ গোত্রের হযরত উবাদা ইবন সামিত গেলেন সিরিয়ায়। বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক আনসার উবাদা ইবন সামিত সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন মানুষকেই ভয় করেন না। সিরিয়ায় ব্যবসা ও শাসনকার্যে কতকগুলো অনিয়ম দেখে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

দামেশকের মসজিদ। সিরিয়ার গবর্ণর মুয়াবিয়াও উপস্থিত মসজিদে। নামাযের জামাত শেষে হযরত উবাদা ইবন সামিত উঠে দাঁড়িয়ে মহানবীর (সা) একটি হাদীস উদ্ধৃত করে তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করলেন হযরত মুয়াবিয়াকে। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। মুয়াবিয়ার পক্ষে তাঁর মুখ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। একা উবাদা ইবনে সামিত গোটা সিরিয়াকে যেন নাড়া দিলেন। ইতোমধ্যে হযরত উমার (রা) ইন্তিকাল করেছেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে হযরত মুয়াবিয়া তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানকে (রা) লিখলেন, "হয় আপনি উবাদাকে মদীনায় ডেকে নিন, নতুবা আমিই সিরিয়া ত্যাগ করব। গোটা সিরিয়াকে উবাদা বিদ্রোহী করে তুলেছে।"

উবাদাকে মদীনায় ফিরিয়ে আনা হলো। মদীনায় এসে হযরত উবাদা সোজা গিয়ে হযরত উসমানের (রা) বাড়ীতে উঠলেন। হযরত উসমান (রা) ঘরে বসে, ঘরের বাইরে প্রচুর লোক। তিনি ঘরে ঢুকে ঘরের এক কোণে বসে পড়লেন। হযরত উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর।" হযরত উসমানের (রা) কথার উত্তরে উবাদা উঠে দাঁড়ালেন। স্পষ্টবাদী, নির্ভীক উবাদা বললেন, "স্বয়ং মহানবীর

উক্তি পরবর্তী কালের শাসকরা অসত্যকে সত্যে এবং সত্যকে অসত্যে পরিণত করবে। কিন্তু পাপের অনুকরণ বৈধ নয়, তোমরা কখনও অন্যায় করো না।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হযরত উবাদা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "যখন আমরা মহানবীর (সা) হাতে বাইয়াত করি, তখন তোমরা ছিলে না, কাজেই তোমরা অনর্থক কথার মাঝখানে বাধা দাও কেন? আমরা সেদিন মহানবীর (সা) কাছে শপথ করেছিঃ সুস্থতা ও অসুস্থতা সব অবস্থায়ই আপনাকে মেনে চলব, প্রাচুর্য ও অর্থ সংকট সব অবস্থায়ই আপনাকে অর্থ সাহায্য করব, ভাল কথা অন্যের কাছে পৌছাব, অন্যায় থেকে সবাইকে বারণ করব। সত্য কথা বলতে কাকেও ভয় করবো না।"

হযরত উবাদা এসব শপথের প্রতিটি অক্ষর পালন করে গেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত। তাঁকে কিছু অসিয়ত করতে বলা হলে তিনি বললেন, "যত হাদীস প্রয়োজনীয় ছিল, তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি, আর একটি হাদীস ছিল, বলছি শুন।" হাদীস বর্ণনা শেষ হবার সাথে সাথেই হযরত উবাদা ইবন সামিত ইন্তিকাল করলেন।

ইয়ারমুকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল যারা

ইয়ারমুক প্রান্তরে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এটা এক মরণ পণ সংগ্রাম। রোম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে নিপুণ সেনাপতি ম্যানোয়েল বা মাহান দুই লক্ষেরও অধিক সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ৪০ হাজার সৈন্যের এক ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর উপর। একদিন নয় দুদিন নয়, ৫ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে। রোমক সৈন্যদের পায়ে শৃঙ্খল লাগানো হয়েছে যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে না পারে। অর্থাৎ জিততে না পারলে আত্মবলি দেবে এই দুর্জয় পণ নিয়েই রোমকরা যুদ্ধে নেমেছে। একদিন যুদ্ধ করতে করতে ইয়ারমুক বিজয়ের মুলস্তম্ভ মহাবীর খালিদ ইবন ওয়ালিদের হাত অবিরাম তরবারী চালনায় প্রায় অবশ হয়ে পড়ল।

এটা দেখে হারেস ইবনে হিশাম প্রধান সেনাপতি আবু উবাইদাকে বললেন, 'খালিদের তলোয়ারের হক যতখানি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী খালিদ করে দেখিয়েছেন। তাঁকে এবার আরাম দেয়া দরকার। হযরত আবু উবাইদা তাঁর কথায় সায় দিয়ে খালিদের সমীপবর্তী হয়ে তাঁকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন। খালিদ তার উত্তরে বললেন, "আমি সব রকমে সবদিকে থেকে চেষ্টা করে শাহাদাত লাভের আশা করি, আমার নিয়ত আল্লাহ তায়ালাই জানেন।" বলে তিনি আবার শত্রু ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। দু'লক্ষাদিক রোমক সৈন্যের বিরুদ্ধে ৪০ হাজার মুসলিম সৈন্যের প্রত্যেকে এ ভাবেই লড়ে যাচ্ছে।

একদিকে যখন এই অবস্থা আহতদের কাতারে আর এক দৃশ্য। আবু জাহিম ইবনে হুজাইফা আহত নিহতদের সারিতে তাঁর

চাচাতো ভাইকে খুঁজে ফিরছিলেন। তাঁর কাঁধের মশকে পানি। খুঁজতে খুঁজতে তিনি তাঁর ভাইকে পেয়ে গেলেন। সে তখন মুমূর্ষ। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে। ইশারায় সে পানি চাইল। হুজাইফা তাঁকে পানি দিতে গেলেন। এমন সময় পাশেই আর একজন মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। তারও পানি চাই। হুজাইফার ভাই পানি পান না করে পাশের হিশাম ইবন আবিল আসের কাছে তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে যেতে বললেন। হুজাইফা যখন হিশামের কাছে পৌঁছলেন, তখন পাশের আর একজন মুমূর্ষ সাহাবী পানি পান করতে চাইলো। হিশাম ইংগিতে প্রথমে তাকেই পানি দিতে বললেন। হুজাইফা যখন পানি নিয়ে পাশের সাহাবীর কাছে পৌছলেন, তখন তাঁর রূহ ইহজগত ছেড়ে চলে গেছে। হুজাইফা ফিরে এলেন হিশামের কাছে। কিন্তু হিশামও ততক্ষণে জান্নাতবাসী হয়েছেন। হুজাইফা ফিরে গিয়ে তার চাচাতো ভাইকেও আর পেলেন না। ততক্ষণে শাহাদাত বরণ করেছেন তিনিও।

অদ্ভুত এ ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব আর মমত্ববোধ। তাঁরা পরস্পরে মিলে এমন সিসার প্রাচীর গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই সেদিন মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য ইয়ারমুক প্রান্তরে সমগ্র এশিয়ার সম্মিলিত খৃষ্টান শক্তির বিজয়ের প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকে শোচনীয় পরাজয়ের অতল পঙ্কিলে ডুবিয়ে দিতে পেরেছিল।

রোমান সেনাপতি মাহানের তাঁবুতে খালিদ

ইয়ারমুক যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রধান সেনাপতি মাহানের অধীনে কয়েক লক্ষ সৈন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় দন্ডায়মান। এমন সময় ময়দানের অপর প্রান্তে মুসলিম শিবিরে খবর এল, রোমক সেনাপতি মাহান মুসলিম দূতের সাথে দেখা করতে চান। এই আহবান অনুসারে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আবু উবাইদার নির্দেশে খালিদ ১০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মাহানের শিবিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কয়েক লক্ষের বিশাল বাহিনীর মধ্য দিয়ে বীরদর্পে খালিদ তাঁর ১০০ জন সাথী সহ মাহানের দরবারে গিয়ে পৌছলেন।

রোমক সেনাপতি মাহান চাইলেন রোমক সৈন্যের শান শওকত ও রোমক দরবারের ঐশ্বর্য দেখিয়ে মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দিতে। কিন্তু হযরত খালিদ যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত ও কিংখাব খচিত চেয়ারগুলো সরিয়ে রেখে মেঝেতে নিঃশংকোচে আসন গ্রহণ করলেন, তখন যে মাহান মুসলমানদের দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন নিজেই মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তারপর মাহানের সাথে খালিদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো। মাহান এক সময় বললেন, "মুসলিম সৈন্যের প্রত্যেককে একশত দিনার, আবু উবাইদাকে তিনশত দিনার এবং খলীফাকে দশ হাজার দিনার আমি দান করছি, বিনিময়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে।" খালিদ পাল্টা দাবী উত্থাপন করলেন, "হয় জিযিয়া দিন, নয় তো ইসলাম গ্রহন করুন।" মাহান খালিদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান

করে বললেন, "ঠিক আছে তলোয়ারই সব ফায়সালা করে দেবে।" উত্তরে খালিদ বললেন, "যুদ্ধের বাসনা আপনাদের চেয়ে আমাদেরই বেশী এবং আমরা অবশ্য আপনাদের পরাজিত করব। বন্দী করে খলীফার দরবারে হাজির করব।"

মাহান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা, এখনই তোমাদের সামনে তোমাদের পাঁচ জন বন্দী বীরকে হত্যা করছি।" সংগে সংগে খালিদ বলে উঠলেন, "তুমি আমাদের মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ। অথচ মৃত্যুই আমাদের কাম্য। মুসলমানদের জীবন তো মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়। কিন্তু জেনে রাখ, কোন বন্দীর গায়ে যদি হাত তোল তাহলে এখনই তোমাকে আমরা সদল বলে হত্যা করব। তোমাদের সংখ্যাধিক্যের পরোয়া আমরা করি না।"

লক্ষ লক্ষ রোমক সৈন্য পরিবেষ্টিত শিবিরে খালিদের এই বীরত্বপূর্ণ কথা মাহানের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে দিল। সে খাপ থেকে তলোয়ার বের করার জন্য তলোয়ারের বাঁটে হাত দিল। শিবিরে উপস্থিত কয়েকশ রোমক সৈন্যও প্রস্তুত হয়ে দন্ডায়মান। কিন্তু তলোয়ার বের করার সুযোগ সে পেলোনা। হযরত খালিদ এক লাফে তার সমীপবর্তী হয়ে তার বুকে তলোয়ারের অগ্রভাগ ঠেকিয়ে নির্দেশ দিলেন, "সব প্রহরীদের অস্ত্র ফেলে দিতে বল, এবং কেউ যাতে কোন বাধা দিতে এগিয়ে না আসে, সে নির্দেশ ঘোষণা কর।" ভীত ও বিস্ময় বিস্ফারিত মাহান সে নির্দেশ পালন করল।

খালিদ তার সংগিগণ সহ বিশাল সৈন্য সারির মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে স্বীয় তাঁবুতে এসে পৌছলেন।

সেনাপতি হলেন সাধারণ সৈনিক

সিরিয়ার রণক্ষেত্র। সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক খালিদ সৈন্য পরিচালনা করছেন। মদীনা থেকে খলীফা উমারের (রা) দূত শাদ্দাদ ইবনে আউস খালিদের পদচ্যুতি এবং সেনাপতি আবু উবাইদার প্রধান সেনাপতি মনোনয়নের চিঠি নিয়ে এলেন সিরিয়ায়। সিরিয়ার সেনাশিবির। সকল সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষরা উপস্থিত। খলীফার দূত শাদ্দাদ সকলের সামনে সর্বাধিনায়ক খালিদের পদাবনতি এবং আবু উবাইদার প্রধান সেনাপতি পদে মনোনয়নের কথা ঘোষণা করলেন। সেনা ও সেনাধ্যক্ষদের পিনপতন নীরবতা। নীরবভাবে খালিদও খলীফার নির্দেশনামার পাঠ শুনলেন। তারপর নীরবে নতমুখে তিনি সেনাপতির পদ থেকে পিছনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। শূন্যস্থান পূরণ করলেন গিয়ে আবু উবাইদা।

সর্বাধিনায়ক খালিদ সাধারণ সৈন্যের সারিতে মিশে গেলেন। এই পদাবনতিতে খালিদের চোখ কি ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল? কিংবা অপমানে তাঁর মুখ কি লাল হয়ে উঠেছিল? অথবা তাঁর গন্ডদ্বয় বয়ে কি দুঃখের অশ্রু নেমে এসেছিল? না, এগুলোর কিছুই হয়নি তাঁর, সিরিয়া মরু দেশের প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ঘোরা খালিদের রোদপোড়া লাল মুখটিতে তাঁর আগের সেই উজ্জ্বল হাসি–সেই শান্ত স্বর্গীয় নুরানী দীপ্তি তখনও। তাঁর শির মুহূর্তের জন্য আনত হয়েছিল খলীফার নির্দেশ মাথা পেতে নেবার জন্য। তারপর তাঁর শির সেই আগের মতই উন্নত। সে শিরে লজ্জা অপমান কোন স্থান পেলনা, দুঃখের কালিমাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারলো না। তিনি পিছনের

সারিতে দাঁড়িয়ে বললেন, "হযরত উমার (রা) কোন হাবশী গোলামকেও যদি আমার নেতা মনোনীত করতেন, তবু তাঁর আদেশ সানন্দে মেনে আমি জিহাদ চালিয়ে যেতাম। আর হযরত আবু উবাইদা তো কত উঁচু দরের লোক।"

পদাবনতির ফলে কোন স্বাভাবিক নিরুৎসাহও কি হযরত খালিদকে ঘিরে ধরেছিল? তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা-গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছিলেন? না, কোনটিই নয়। পদচ্যুত হবার পর মুহূর্তেই সেনাপতি আবু উবাইদার নির্দেশে তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাফরের সাহায্যে এক রণক্ষেত্রে ছুটে যান, প্রাণপণ যুদ্ধ করেন, জয়ীও হন সেখানে।

এই আনুগত্য, এই আন্তরিকতা; এই নিবেদিত চিত্ততার কোন নজীর ইতিহাসে নেই। একজন প্রধান সেনাপতি দেশের পর দেশ জয় করলেন, যিনি পেলেন সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আনুগত্য, তিনি বিনাবাক্য ব্যয়ে পদাবনতি মেনে নিয়ে অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষের অধীনে সাধারণ সৈনিকের মত পূর্বের ন্যায় একই আন্তরিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছেন, নেতৃত্ব ও সামরিক শৃংখলার প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন অপরূপ-বিস্ময়কর। বিস্ময়কর নয় শুধু ইসলামের ইতিহাসে-মুসলমানদের জন্য, যারা যুদ্ধ করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ধন-মান-পদের লোভে নয়।

যেই হিন্দা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হামজার কলিজা চিবিয়েছিলেন, সেই হিন্দা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় লাভের পর নতুন এক জীবনে বিমূর্ত হয়ে উঠলেন। যে রূপে আমরা তাঁকে উহুদ প্রান্তরে দেখেছিলাম তার ঠিক বিপরীত রূপে আমরা তাঁকে দেখি ইয়ারমুক রণক্ষেত্রে।

ইসলামের বিস্ময়কর আবির্ভাব ও অভ্যুত্থানে পূর্বরোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা বিচলিত হয়ে পড়েন। রোম সাম্রাজ্যের পাশেই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় তাঁর অস্তিত্বের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর। তাই মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য রোমান শাসনকর্তা বিরাট বাহিনী সমাবেশ করলেন ইয়ারমুক প্রান্তরে। মুসলিম বাহিনীও এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। হিন্দা তখন বেঁচে আছেন। তুষার শুভ্র কেশ। জীর্ণ দেহ। বেশ কিছু সংখ্যক মহিলার সংগে তিনি ইয়ারমুক রণাংগনে আসেন।

কাতারে কাতারে মুসলিম সৈন্য অগ্রসর হয়ে চলেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। বিপুল রক্তক্ষয়ী সে সংগ্রাম। অপূর্ব সাহস ও বীরত্বের সাথে মুসলিম সৈন্য যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু বিপুল শত্রুসৈন্যের সম্মুখে তারা অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। পেছনে হটতে লাগলো। মুসলিম সৈন্যের পরাজয় আসন্ন হয়ে দেখা দিল। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা তাঁবুর দিকে ছুটতে লাগলো। হঠাৎ রণক্ষেত্রে হিন্দা তাঁর সাথীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। চীৎকার করে তিনি মুসলিম সৈন্যদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "কাপুরুষ, কোন মুখে

তোমরা পরাজয় বরণ করে ফিরে আসছো, তোমাদের লজ্জা করেনা? হটে যদি আসতে চাও, তবে এই নাও আমাদের অলংকার, আমাদের মুখাবরণ, তাঁবুতে প্রবেশ কর। আমরা নারীরা তোমাদের অশ্বে আরোহণ করে যুদ্ধ করবো। জয়লাভ করবো।” হিন্দার এই তেজোদীপ্ত উক্তিতে মুহূর্তে যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। নবীন উৎসাহে পূর্ণ তেজে মুসলিম সৈন্য ফিরে দাঁড়ালো। অমিতবিক্রমে রোমান সৈন্যদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করল। সেই আক্রমণের বেগ তারা সহ্য করতে পারলো না। শোচনীয় পরাজয় বরণ করল রোমান বাহিনী।

ইকরামা ইবন আবু জাহলের শাহাদাত

ইসলামের মুখর শক্র ইকরামা ইবন অবু জাহল ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের আগে একদিন যে কট্টর শক্র ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর সে হয়ে উঠল একজন জানবাজ মুজাহিদ। তাঁর প্রাণে জ্বলে উঠল ঈমানের আগুন- শহীদের রক্তবীজ সঞ্চারিত হলো তাঁর প্রাণমূলে। অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছেন তিনি। আলোর স্পর্শ তাঁকে পাগল করে তুলেছে। সংগ্রামের প্রাণশক্তি তাঁর প্রাণ জগত থেকে উপছে উঠছে। কিন্তু এ প্রাণশক্তি তিনি রাখবেন কোথায়? শীঘ্রই সুযোগ এল। এল যুদ্ধের ডাক। ইকরামা সাড়া দিলেন সে ডাকে। যুদ্ধে শামিল হলেন ইকরামা ইবন আবু জাহল।

ভীষণ যুদ্ধ চলছে ইয়ারমুকে। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য প্রাণের আবেগে ইকরামা প্রাণপণ সংগ্রামে নিরত। বাতিলের রক্তে স্নান করে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে-শহীদের রক্ত শয্যায়। পাশেই কিছু দূরে ছিলেন মহান সেনানায়ক খালিদ ইবন ওয়ালিদ। তিনি দেখতে পেলেন ভূমি শয্যায় শায়িত ইকরামা ইবন আবু জাহলকে। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। ইকরামার কাছে এসে তিনি ঘোড়া থেকে দ্রুত নামলেন। ইকরামার জীবনী শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল। খালিদ তাঁর মাথা তুলে নিলেন কোলে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ইকরামা বললেন, "খলীফা উমার আমার শাহাদাত লাভের শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আজ আমার আনন্দ যে, আমার অন্তরের জীবন্ত বিশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ আমি শহীদ হতে চলেছি।" শাহাদাতের আকুল পিয়াসা ইকরামাকে পাগল করে তুলেছিল। সেই পিয়াসা নিয়ে ইকরামা শাহাদাত বরণ করলেন।

যুদ্ধশেষে পা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন হারারা ইবনে কায়েস

ইয়ারমুকের প্রান্তর। মুসলিম ও রোমক বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ২লক্ষ ৪০ হাজার রোমক সৈন্যের নেতৃত্ব করছেন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র স্বয়ং। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছেন সেনাপতি আবু উবাইদাহ এবং তাঁর অধীনে রয়েছেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ। ২লক্ষ ৪০হাজার রোমক সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য খালিদ ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে এক অপূর্ব কৌশলে ৩৬টি দলে বিভক্ত করলেন। তারপর মুসলিম বাহিনী তার ঐতিহ্য অনুযায়ী রোমক শিবিরে সত্যের দিকে আহবান জানিয়ে শান্তির বার্তা প্রেরণ করল। রোমকরা এর জবাব দিল অস্ত্রের মাধ্যমে।

পুনঃপুনঃ পরাজয়ের গ্লানিতে রোমক বাহিনী ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত আপতিত হলো ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর উপর। কিন্তু আঘাতের পর আঘাত খেয়ে রোমক বাহিনীই অবশেষে কিছু হটল, মুসলিম বাহিনীকে হটাতে পারল না এক ইঞ্চিও।

পরদিন আবার আক্রমন শুরু হল। রোমক বাহিনীই আবার আক্রমণ করল। কিন্তু সেদিন মুসলিম বাহিনী শুধু আত্মরক্ষা নয়, পাল্টা আক্রমণ চালাল। রোমকরা সেদিন জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর মুসলমানরা তো হয় জয় নয় শাহাদাতের আকাংখা নিয়েই যুদ্ধে নেমেছেন। সুতরাং সেদিন ইয়ারমুক প্রান্তরে যে যুদ্ধ শুরু হল তার বর্ণনা অসম্ভব। শত্রুনিধন ছাড়া কারো কোন বাহ্যিক জ্ঞান পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। অদ্ভুত সে দৃশ্য। ২লক্ষ ৪০ হাজার

রোমক সৈন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে বলীয়ান, আর ৪০ হাজার মুসলিম সৈন্যের একমাত্র শক্তিই হলো তাদের ঈমান–সতের জন্য জীবন দেয়ার অদম্য আকাংখা। এক এক মুসলিম সৈন্য সেদিন একশ' জনে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে রোমক শক্তি নেতিয়ে পড়ল, পরাজিত হলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। শত্রু হননে তখন মত্ত তারা। সেনাপতি সৈনিকদের মত্ততা দূর করার জন্য যুদ্ধবিরতির বাদ্য ধ্বনি করতে আদেশ দিলেন। সৈনিকদের সম্বিত ফিরে এলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে তারা যখন চারদিকে চাইলেন, দেখলেন, চারদিকে রোমক সৈন্যের লাশ ছাড়া আর কিছু নেই। মুসলিম সৈন্যের মত্ততা সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, "ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা শত্রু নিধনে এমনি একাগ্র ছিল যে, হারারা ইবন কায়েসের একটি পা যে কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সে টেরই পায়নি। যুদ্ধ শেষে সুপ্তোদিতের মত হাসতে হাসতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি পা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।"

এই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিন হাজার মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন, আর রোমক পক্ষে মারা গিয়েছিল ১লক্ষ ১৪ হাজার সৈন্য।

এই শোচনীয় পরাজয় বার্তা শ্রবণ করে রোম সম্রাট এশীয় ভূখন্ড ছেড়ে কনষ্ট্যান্টিনোপলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাবার সময় যুগ যুগ ধরে ভোগ করা সিরিয়ার নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "বিদায় হে সিরিয়া, শত্রুদের জন্য তুমি কি সুন্দর দেশ!"

কাদেসিয়া প্রান্তর। পারস্য সম্রাটের সাথে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর এক ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। তদানীন্তন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলা কবি খানসা তাঁর চার ছেলে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই খানসা তাঁর ছেলেদের কাছে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, "তোমাদের আমি বহুকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছি, বহু দুঃখ বিপদের ভেতর দিয়ে মানুষ করে তুলেছি, এখন আমার কথা শোন, সত্যের জন্য যুদ্ধ করার মহত্বের কথা স্মরণ কর আর স্মরণ কর, কুরআনের নির্দেশ –দুঃখ বিপদের মধ্যে ধৈর্য ধারণে বজ্রসার আদেশ। কাল প্রভাতে সুস্থ মনে শয্যা ত্যাগ করে শংকাহীন চিত্তে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করবে–সর্বাপেক্ষা সাহসী যোদ্ধার সম্মুখীন হবে এবং প্রয়োজন হলে নির্ভীক চিত্তে শহীদ হবে।"

পরদিন খানসার চার ছেলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং একে একে চার জনই শহীদ হলেন। সংবাদ বীর মাতার কাছে পৌঁছলে তিনি দু'হাত উপরে তুলে বললেন, "আল্লাহ, আমাকে আপনি শহীদের মাতা হবার সৌভাগ্য দান করেছেন, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।" কোন শোকোচ্ছ্বাস নেই। দুঃখের আবিলতা নেই–এক পরম তৃপ্তিতে মায়ের বুক ভরে গেছে–পুত্ররা তাঁর সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে। এর চাইতে গৌরবজনক মৃত্যু আর কি হতে পারে!

৬৮০ সন। আমীর মু'আবিয়া মৃত্যুবরণ করেছেন। পিতার সিংহাসনে বসেছেন ইয়াযিদ। হযরত মু'আবিয়া এবং ইয়াযিদ ইসলামের গণতন্ত্র, ইসলামের খিলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিণত করলেন এইভাবে। সাধারণের রাজকোষ –বাইতুল মাল পরিণত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। ইয়াযিদের খলীফা পদে আসীন হওয়া একদিকে ছিল স্বীকৃত চুক্তির খেলাফ, অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়ার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন হযরত হুসাইন। এত বড় অন্যায়কে, ইসলামী আদর্শের এই ভূলুণ্ঠিত দশাকে বরদাশত করা যায় কি করে? মদীনায় অলসভাবে বসে থেকে ইসলামের এই অবস্থা, মুসলিম জাতির এই দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। পারেন না বলেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কুফা থেকে সেখানকার অধিবাসীরা জানালঃ আসুন, আমরা আপনাকে এ ন্যায়ের সংগ্রামে সাহায্য করব। তাদের আহবান মতে মুষ্টিমেয় সাথী ও নিজের আত্মীয়-পরিজন নিয়ে রওনা হলেন তিনি কুফার দিকে।

কুফার পথে হযরত হুসাইন এসে উপস্থিত হলেন কারবালা মরু প্রান্তরে। সামনেই ইউফ্রেটিস-ফোরাত নদী। তিনি দেখলেন, ফোরাত নদী ঘিরে রেখেছে ইয়াযিদ সৈন্যরা। তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকেও ঘিরে ফেলা হয়েছে। সামনে পিছনের সব দিকের পথ বন্ধ। বাধ্য হয়ে হযরত হুসাইন তাঁবু গাড়লেন ফোরাত নদীর তীরে।

প্রস্তাব এল ইয়াযিদের সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছ থেকে, "বিনা শর্তে আত্মসমর্পন করতে হবে।"

আত্মসমর্পন? অন্যায়ের কাছে, অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ? একজন জিন্দাদিল মুসলমান, একজন জিন্দাদিল মুজাহিদের পক্ষে এমন আত্মসমর্পণ কি জীবন থাকতে সম্ভব? সম্ভব নয়। নবীর (সা) দৌহিত্র হযরত হুসাইনের পক্ষেও তা সম্ভব হলোনা।

হযরত হুসাইনকে আত্মসমর্থণে বাধ্য করার জন্য সে ক্ষুদ্র দলের উপর চললো নিপীড়ন। ফোরাতের তীর বন্ধ করে দেয়া হলো। কোথাও থেকে এক কাতরা পানি পাবারও কোন উপায় রইলনা। শুরু হলো খন্ড যুদ্ধ।

অদ্ভুত এক অসম যুদ্ধ। একদিকে সত্তরজন, অন্য দিকে বিশ হাজার। হযরত হুসাইনের জানবাজ সব সাথীই একে একে শাহাদাত বরণ করেছেন। ক'দিন থেকে পানি বন্ধ। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে সকলের। দুধের বাচ্চা মায়ের দুধ পাচ্ছে না। অবোধ শিশুদের ক্রন্দনে আকাশ যেন বিদীর্ণ হচ্ছে। হযরত হুসাইন সবই দেখছেন, শুনছেন। নীরব-নির্বিকার তিনি। জীবন যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের কাছে তো নতি স্বীকার চলে না!

সংগ্রামী সাথীদের সবাই একে একে চলে গেছে জান্নাতে। একা হযরত হুসাইন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ফোরাত থেকে পানি আনার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। তিনি দুলদুল নিয়ে চললেন ফোরাতের দিকে। নদীর তীরে পৌছলেনও তিনি। কিন্তু অজস্র তীরের প্রাচীর এসে তাঁর গতি রোধ করল। তাঁবুতে ফিরে এলেন হযরত হুসাইন। এসে দেখলেন স্ত্রী শাহারবানু শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পানির অভাবে মুমূর্ষ তাঁর শিশুপুত্র। হুসাইন সহ্য করতে পারলেন না এ দৃশ্য। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে তিনি ছুটলেন আবার ফোরাতের দিকে। পানির কাছে পৌঁছার আগেই শত্রুর নির্মম তীর এসে বিদ্ধ করল পুত্রের কচি বুক! ফোরাতের কুলে আর নামা হলো না। মৃত শিশু পুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। মৃত শিশুকে

স্ত্রী শাহারবানুর হাতে তুলে দিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত হুসাইন বসে পড়লেন। রক্তে ভেজা তাঁর দেহ। তারপর হযরত হুসাইন হাত দু'টি তাঁর উর্ধে তুললেন। দু'হাত তুলে তিনি জীবিত ও মৃত সকলের জন্য দোয়া করলেন। তারপর স্ত্রী শাহারবানুকে বিদায় সালাম জানিয়ে মর্দে মুজাহিদ সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইয়াযিদ বাহিনীর উপর। সে বিক্রম বিশ হাজার সৈন্যের পক্ষেও বরদাশত করা সম্ভব হলো না। নদীকূল ছেড়ে পলায়ন করল ইয়াযিদ সৈন্যরা। কি শক্তি বিশ্বাসীর, সত্যাশ্রয়ীর!! বহুর বিরুদ্ধে একের সংগ্রাম, তবু সে অজেয়-অদম্য।

কিন্তু অবিরাম রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়লেন নবী দৌহিত্র হুসাইন। সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি ফোরাতের তীরে, কারবালার মরু বালুতে। শত্রুর নির্মম খঞ্জর এসে স্পর্শ করল তাঁর কণ্ঠ। পবিত্র রুধির ধারায় প্লাবিত হলো কারবালার মাটি।

হযরত হুসাইন প্রাণ দিলেন, কিন্তু সত্যের উন্নত শিরকে আকাশস্পর্শী করে গেলেন। সত্যের সে উন্নত শির আনত হয়নি কখনও, এখনও নয়, হবেও না কোনদিন। শহীদের এই লহুতে স্নান করেই পতনের পংক থেকে বার বার গড়ে উঠছে জাতি, দেশ, স্বাধীনতা এবং সত্যের শক্তি-সৌধ।

জাহাজ পোড়ানো তারিক

৭১১ সন। মুসলিম সেনাপতি তারিক ইবন যিয়াদ ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের মাটি–জিব্রালটারে পা রাখলেন। তাঁর সাথে ৭শ' সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী। এ ক্ষুদ্র বাহিনী দেখে স্পেনরাজ রডারিক হেসেই আকুল। সাগর–উর্মির ন্যায় বিপুল রডারিকের সৈন্যের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে মুসলিম সৈনিকদের মনেও অজ্ঞাতে নানা প্রশ্ন ভিড় জমিয়েছিল। কিন্তু সেনাপতি তারিক অচল–অটল। বিজয় আসে সত্য–ন্যায়ের শক্তিতে, সংখ্যাধিক্যে নয়। বদর উহুদ, ইয়ারমুক, কাদেসিয়া প্রভৃতি কত ক্ষেত্রে কতবার তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

অকুতোভয় তারিক ইবন যিয়াদ জিব্রালটারে নেমে জাহাজে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলেন সব জাহাজ। তারপর সৈন্যদের দিকে চেয়ে বললেন, "চেয়ে দেখ বন্ধুগণ, গভীর সমুদ্র আমাদের পেছনে গর্জন করছে। আর সামনে অন্যায় অবিচারের প্রতীক বিশাল রডারিক বাহিনী। আমরা যদি পালিয়ে যেতে চাই, সমুদ্র আমাদের গ্রাস করবে। আর যদি আমরা সামনে অগ্রসর হই, তাহলে ন্যায় ও বিশ্ব–কল্যাণ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমরা শহীদ হবো, কিংবা বিজয় মাল্য লাভ করে আমরা গাজী হবো। এই জীবনমরণ সংগ্রামে কে আমার অনুগামী হবে?" মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকই বজ্র নির্ঘোষে 'তাকবীর' দিয়ে সেনাপতি তারিকের সাথে ঐক্যমত ঘোষণা করল।

স্পেনরাজ রডারিকের প্রধান সেনাপতি থিওডমিরের নেতৃত্বাধীন বিশাল এক বাহিনীর সাথে মুসলিম সৈন্যের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত

হলো। সে এক অসম যুদ্ধ। যুদ্ধ বিজ্ঞানের উচিত অনুচিতের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হবে, নিতান্ত আত্মহত্যার খাহেশ নিয়েই ৭০০ সৈন্যের মুসলিম বাহিনীটি এ বিদেশ বিভুয়ে এসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু এই অসম যুদ্ধই এক ইতিহাস সৃষ্টি করল। জানবাজ মুসলিম বাহিনীর প্রচন্ড পাল্টা আক্রমণে রডারিক বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

মুসলিম সৈন্য ও তাদের সেনাপতির শৌর্যবীর্য ও সাহস দেখে সেনাপতি থিওডমির বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে রাজা রডারিককে লিখে পাঠালেন, "সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও অদ্ভুত শৌর্য বীর্যের অধিকারী মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি আমি রুখতে পারলামনা।?"

এই ভাবেই সত্যের জয় হল–ইসলামের বিজয় পতাকা উডডীন হলো স্পেনে। তারপর গৌরবময় মুসলিম শাসন চললো সেখানে দীর্ঘ ৭শ' বছর ধরে। কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগাকে কেন্দ্র করে যে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ঘটল, তা সারা ইউরোপকে আলোকিত করে তুললো। অন্ধকার ইউরোপের বুকে সূর্যশিখার মতোই জ্বলছিল কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান শিখা। সেখানে জ্ঞান আহরণের জন্য ইউরোপের সব দেশ থেকেই ছুটে এসেছিল জ্ঞান পিপাসুরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম মনীষীদের কাছ থেকে সেদিনের অন্ধকার ইউরোপ জ্ঞানের এ.বি.সি.ডি শিক্ষা করল। কর্ডোভার এই ছাত্ররাই ছিল ইউরোপীয় জাগরণের স্থপতি। সুতরাং আজকের যে ইউরোপ তার ঘুম ভাঙিয়েছে মুসলমানরাই। আর তাদের এ ঘুম ভাঙার প্রথম গান গেয়েছিলেন তারিক ইবন যিয়াদ। তিনি গোথিক শাসনের নির্মম নিষ্পেষণ থেকে শুধু স্পেনকেই মুক্ত করেননি, বলা চলে স্মরণাতীত কালের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকেও তিনি জাগিয়েছেন ইউরোপকে।

'যার ভান্ডার শুধু অভাবগ্রস্তদের জন্যই খোলা'

রাজধানী দামেসক। খলীফা উমার ইবন আব্দুল আযিয তখন খলীফার আসনে সমাসীন। মুসলিম বিশ্বের কয়েকজন খ্যাতনামা কবি এলেন দামেসকে। তাঁদের ইচ্ছা, অন্যান্য রাজ দরবারের মত উমার ইবন আবদুল আযিযের দরবারে গিয়েও খলীফার কিছু স্তুতিগান করে আর্থিক ফায়দা হাসিল করা। তাঁরা অনেকদিন রাজধানীতে থাকলেন। সবাই জানল ব্যাপারটা। কিন্তু খলীফার দরবার থেকে ডাকসাইটের কোন আহ্বান এলো না। অবশেষে তাঁরা নিজেরাই খলীফার সাথে সাক্ষাতের মনস্থ করলেন। সব কবি মিলে সবচেয়ে মুখর ও মশহুর কবি জরিরকে দরবারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

জরির দরবারের দ্বারে এসে সিরিয়ার বিখ্যাত ফকিহ্ আউস ইবন আবদুল্লাহ্ হাযালীর মাধ্যমে খলীফার সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। হযরত আউস গিয়ে জরিরের পরিচয় দিয়ে তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনার কথা বললেন।

খলীফা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কবি জরির খলীফার সমীপে হাজির হয়ে বললেন, "আমি শুনেছি আপনি প্রশংসা-প্রশস্তি ভালোবাসেন না। জনগণের কল্যাণ কামনায় সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন আপনি। আমি এ ধরণের কিছু কবিতা রচনা করেছি শুনুন।" কবি জরির হিজাযের ইয়াতীম বালক বালিকা ও বিধবাদের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা সম্বলিত কবিতা পাঠ করতে লাগলেন।

উমার ইবন আব্দুল আযিয মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ কবিতা শুনছিলেন। দৃষ্টি তাঁর আনত। মুখে অপরিসীম বেদনার ছায়া। দু'গন্ড বেয়ে অবিরাম ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

কবিতা পাঠ শেষ হবার সাথে সাথে বাইতুল মালের প্রধান সচিবকে ডেকে পাঠালেন এবং টাকা পয়সা, শস্য, কাপড় ইত্যাদি সহ একটি সাহায্য কাফিলাকে তৎক্ষনাৎ হিজায যাত্রার নির্দেশ দিলেন। তার পর তিনি জরিরের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কি মুহাজির?" জরির বললেন, "না, আমি মুহাজির নই।" আবার জিজ্ঞাসা করলেন খলীফা, "আপনি কি অভাবগ্রস্ত আনসার অথবা তাদের কোন প্রিয়জন?" জরির বললেন, "না"। খলীফা পুণরায় প্রশ্ন করলেন, "যারা ইসলামের বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল, আপনি সেই জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের কোন আত্মীয়?" জরির বললেন, "না। আমি তাদেরও কেউ নই।" খলীফা তখন বললেন, "তাহলে আমার ধারণায় বাইতুল মালে এই মুহূর্তে আপনার কোন অংশ নেই।"

বাকপটু জরির তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি একজন মুসাফির। বহুদূর থেকে আপনার কাছে এসেছি এবং অনেক দিন থেকে আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছি।" খলীফা একটু হেসে বাইতুল মালের সচিবকে কানে কানে কিছু বললেন। বাইতুল মালের সচিব বিশটি দিনার নিয়ে এল।

খলীফা এই বিশটি দিনার কবির হাতে দিয়ে বললেন, "এই দিনার কয়টি আমার এই মুহূর্তের সম্বল। ইচ্ছা হলে এইগুলো গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন অথবা আমার বদনাম করুন।" কবি জরির বিস্ময় বিমূঢ়, কিন্তু চোখে তাঁর আনন্দের নৃত্য। বললেন তিনি, "বদনাম নয়, আমি এর জন্য গৌরবই বোধ করব," বলে বিশটি দিনার নিয়েই কবি জরির দরবার ত্যাগ করলেন। এসে অপেক্ষমান সাথীদের বললেন, "আমি এমন এক রাজদরবার থেকে এসেছি যার ভান্ডার শুধু দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্যই খোলা।"

'কিছু অভাব অভিযোগের কথা নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু এখন দেখি— — —'

খলীফা সুলাইমান তাঁর মৃত্যুর পূর্বে গাসবা ইবন সাদ ইবন আসকে বিশ হাজার দীনার দান করে একটি দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকাটা গাসবার হাতে যাওয়ার পূর্বেই খলীফা সুলাইমানের মৃত্যু ঘটে।

খলীফা সুলাইমানের মৃত্যুর পর উমার ইবন আবদুল আযিয খলীফা হন। তাঁর খলীফা পদে সমাসীন হবার কয়েকদিন পর গাসবা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, "খলীফা সুলাইমান আমাকে কিছু অর্থ দান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশ কোষাগারে এসে পৌছেছে। আপনি আমার বন্ধুলোক, আশা করি আমার জন্য খলীফা সুলাইমানের সে নির্দেশ আনন্দের সাথেই কার্যকর করবেন।"

সত্যিই গাসবা উমার ইবন আবদুল আযিযের বন্ধু ছিল। তিনি সহাস্যে বললেন, "কতটাকা?" গাসবা উত্তর দিল "বিশ হাজার দিনার।" শুনে খলীফা উমাবের ভ্রুদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "সর্ব সাধারনের সম্পত্তি থেকে কোন একজনকে বিনা কারণে এত টাকা দেয়া কিভাবে সম্ভব? আল্লাহর কসম, আমার পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।"

শুনে গাসবা খুবই রেগে গেল। কিন্তু রাগ চেপে সে চিন্তা করতে লাগল, কিভাবে খলীফাকে উচিত জবাব দেয়া যায়, কি করে তাকে জব্দ করা যায়।

সে উমার ইবন আব্দুল আযিযকে খোঁচা দেয়ার একটি পথ পেল। সে বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "খলীফা সুলাইমান আপনাকেও জাবালুল ওয়ারস'-এর জায়গীর দান করেছেন। ওটা সম্পর্কে তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কি হবে?"

প্রশ্ন শুনে খলীফা হাসলেন, "তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্তের অনেক আগে খলীফার আসনে বসার সংগে সংগেই জাবালুল ওয়ারস' সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। ওটা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই ফিরে যাবে, তারপর উপযুক্ত প্রার্থীকে তা দিয়ে দেয়া হবে।" বলে তিনি ছেলেকে দিয়ে সিন্দুক থেকে দলিল-দস্তাবেজ আনালেন। তারপর 'জাবালুল ওয়ারস'-এর দলিলটি বের করে গাসবার সামনেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলেন। গাসবা আর একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে যে সব ফরমান অতীতে জারি হয়নি, উমার ইবন আব্দুল আযিয সে সমস্তই বাতিল করে দিয়েছিলেন। ফলে পূর্ববর্তী খলীফারা বনু উমাইয়াকে অন্যায়ভাবে যেসব ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন, সে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সাথে খলীফার এক ফুফুরও ভাতা বন্ধ হয়েছিল। একদিন ফুফু এই অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে আসলেন। খলীফা তখন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে আবার তাঁর সামনে গিয়ে দেখলেন খলীফা খেতে বসেছেন। তাঁর সামনে দু'টুকরো রুটি, একটু লবণ ও সামান্য কিছু তেল। ফুফু খলীফার খাবারের আয়োজন দেখে বললেন, "কিছু অভাব অভিযোগের কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন দেখি তোমার অভাব-অভিযোগের কথাই আমাকে আগে বলতে হবে।" ফুফুর অভিযোগের জবাবে খলিফা বললেন, "কি করব ফুফু আম্মা, এরচেয়ে ভালো খাবার সংগতি আমার নেই।"

ফুফু অনেক ভূমিকার পর বনি উমাইয়ার পক্ষ থেকে বললেন, "তুমি তাদের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছ, অথচ তুমি সেসব দান করনি?" খলীফা বললেন, "সত্য ও ন্যায় যা আমি তাই করেছি।" তারপর তিনি একটি দিনার, একটি জলন্ত অঙ্গারের পাত্র ও একটুকরো গোশত আনালেন। অঙ্গারপাত্রে দিনারটি গরম করলেন, তারপর অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত দিনার গোশতের উপর চেপে ধরলেন। গোশতটি পুড়ে গেল। খলীফা উমার ইবন আবদুল আযিয সেদিকে ইংগিত করে বললেন, "ফুফুজান, আপনি কি আপনার ভাতিজাকে এরূপ কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে চান না?" ফুফু সবই বুঝলেন। লজ্জিতভাবে ফিরে এলেন খলীফার কাছ থেকে।

'এই বিরান ঘরের সাহায্যেই কি আপন ঘর ঠিক করতে এসেছি?'

খলীফা উমার ইবন আব্দুল আযিযের বাসগৃহ। খলীফার পত্নী ঘরে বসে সেলাই করছিলেন। সে সময়ে একজন মহিলা খলীফার গৃহে প্রবেশ করলো। খলীফার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পরিচয় দিল, "আমি সুদূর ইরাক থেকে এসেছি।" খলীফা পত্নী ফাতিমা মহিলাটিকে ঘরে এসে বসতে বললেন। মহিলাটি ঘরে প্রবেশ করে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। সে খলীফা পত্নীর দিকে চেয়ে বললো, "এই বিরান ঘরের সাহায্যেই কি আপন ঘর ঠিক করতে এসেছি!"

খলীফা পত্নী তা শুনে বললেন, "লোকদের ঘর ঠিক করতে গিয়েই তো এ ঘর বিরান হয়েছে।"

এ সময় খলীফা উমার ইবন আব্দুল আযিয বাড়ি প্রবেশ করলেন। খলীফার ঘরের সামনেই একটা কূপ ছিল। খলীফা কূপ থেকে পানি তুলে উঠানের এক জলাধারে ঢালতে লাগলেন। তিনি পানি ঢালছিলেন আর মাঝে মাঝে ফাতিমার দিকে দেখছিলেন। এটা লক্ষ্য করে ইরাক থেকে আসা মহিলা খলীফা পত্নীকে বললো, "আপনি এ বেহায়া লোকটি থেকে কেন পর্দা করেন না? লোকটি তো নির্লজ্জের মত বার বার আপনাকে দেখছে।" খলীফা পত্নী ফাতিমা হেসে বললেন, "ইনিইতো আমীরুল মুমিনীন।"

খলীফা উমার ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর সালাম করে স্বীয় কক্ষের দিকে চলে গেলেন। জায়নামাযে যাওয়ার আগে খলীফা ফাতিমাকে ডেকে মহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ফাতিমা মহিলাটির আগমনের উদ্দেশ্য খলীফাকে জানালেন। মহিলার সব বিষয় জেনে খলীফা তাকে কাছে ডাকলেন এবং তার বক্তব্য জানতে চাইলেন। মহিলাটি বলল, "আমি খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার পাঁচটি মেয়ে আছে। আমি তাদের ভরণ পোষণ করতে পারি না।" খলীফা তার দুঃখের কাহিনী শুনে খুবই ব্যথিত হলেন। সংগে সংগে তিনি দোয়াত কলম নিয়ে ইরাকের গভর্ণরকে চিঠি লিখলেন। খলীফা মহিলার ১মা, ২য়া, ৩য়া ও ৪র্থা মেয়ের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। আর বললেন, "৫ম মেয়েকে ঐ চারজনের ভাতা থেকেই পরিপোষণ করতে হবে।"

মহিলা চিঠি নিয়ে ইরাক চলে এলো। পরে সময় করে দেখা করলো ইরাকের গভর্ণরের সাথে। গভর্ণর উমার ইবন আবদুল আযিযের চিঠি পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। মহিলাটি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "খলীফা কি মারা গেছেন?" গভর্ণর হাঁসূচক জবাব দিলেন। মহিলাও কাঁদতে শুরু করলো। গভর্ণর তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "তোমার আশংকার কোন কারণ নেই। ঐ মহা মানবের চিঠির অমর্যাদা আমি করব না।" গভর্ণর চিঠির মর্ম অনুসারে মহিলাটিকে তার প্রাপ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।

খলীফা ফরমাশ খাটলেন

খলীফা মামুনের প্রাসাদ। তাঁর প্রাসাদে অতিথি এসেছেন। অতিথি জ্ঞানী ইয়াহইয়া। মেহমান–মেজবান আলোচনায় রত। গভীর রাত। মোমবাতির মিঠা আলো জ্বলছে ঘরে। অতিথির পিপাসা পেয়েছে।

পানির জন্য উৎসুক হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতেই খলীফা মামুন জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাই আপনার?" অতিথি ইয়াহইয়া তাঁর তৃষ্ণার কথা জানালেন। শুনেই খলীফা উঠে দাঁড়ালেন পানি আনার জন্য। ইয়াহইয়া ব্যস্ত হয়ে খলীফাকে অনুরোধ করলেন "আপনি না উঠে কোন ভৃত্যকে ডাকলে হতো না?"

খলীফা মামুন বললেন, "না না, তা হয় না। খলীফা বলেই কি আপনি আমাকে একথা বলছেন? খলীফা পানি নিয়ে আসতে দোষ কি? স্বয়ং মহানবীই (সা) বলে গেছেন, জাতির প্রধান ব্যক্তি, জনগণের সাধারণ ভৃত্য মাত্র।"

ইয়াহইয়া খলীফার এ কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না। মহানবীর (সা) প্রতি, মহানবীর (সা) প্রচারিত আদর্শের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল তাঁর। সর্বশক্তিমানের দেয়া কি সে মহান আদর্শ। সে আদর্শ বাদশাহকে বানিয়েছে ফকির, খলীফাকে বানিয়েছে জনগণের ভৃত্য, সেবক ও রক্ষক।

শাসক যখন সেবক হন

৮৪০ ঈসায়ী সন। খলীফা মুতাসিম চলছেন রাজপথ দিয়ে। রাজকীয় সমারোহে সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করে চলছেন তিনি। জনসাধারণ সসম্ভ্রমে পথ করে দিচ্ছে। চারদিক থেকে অগনিত মানুষ সহাস্য বদনে সালাম জানাচ্ছেন খলীফাকে-খলীফা মুতাসিমকে। খলীফা সকলের দিকে চেয়ে, তাদের সাথে সালাম বিনিময় করে ধীরে ধীরে সামনে এগুচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল রাস্তার উপরে এক বৃদ্ধের উপর। বৃদ্ধটি খলীফাকে পথ করে দেবার জন্য রাস্তা থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছিল। সরতে গিয়ে সে রাস্তার নর্দমায় পড়ে গেল। কাদায়, ময়লায় মলিন হয়ে গেল তার দেহ। নর্দমা থেকে উঠার চেষ্টা করছে সে। সাহায্য পাবার আশায় দু'টি হাত যেন তার অজ্ঞাতেই উপরে উঠেছে। খলীফা সংগে সংগে তার ঘোড়া দাঁড় করালেন। নামলেন ঘোড়া থেকে। ছুটে গেলেন সেই নর্দমার ধারে। সেই বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে অতি সাবধানে তাকে উপরে টেনে তুললেন খলীফা। বৃদ্ধের দেহের কাদা-ময়লা খলীফার দেহের রাজকীয় সজ্জাকেও কর্দমাক্ত করে দিল। কিন্তু খলীফার সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তাকেই পথ করে দিতে গিয়ে এক বৃদ্ধ কষ্ট পেয়েছে, এই বেদনাদায়ক অনুভূতিই তাঁর কাছে বড়। তিনি খলীফা কিন্তু মূলতঃ জনগণের সেবক। জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই তাঁর দায়িত্ব, কষ্ট দেয়া নয়। বৃদ্ধটি খলীফার কাছ থেকে সহাস্য মুখে বিদায় নেয়ার পর খলীফা স্বস্তি লাভ করলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে ফিরে এসে আবার যাত্রা করলেন তাঁর গন্তব্য স্থলের দিকে।

আসামীর কাঠগড়ায় খলীফা আল মানসুর

খলীফা আল-মানসুর এসেছেন মদীনায়। প্রধান কাজী ইবনে ইমরান বিচার সভায় বসে আছেন। একজন উটের মালিক এসে খলীফার বিরুদ্ধে তাঁর কাছে নালিশ জানালো। অষ্টম শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ ও উন্নত ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি খলীফা আল-মানসুরের বিরুদ্ধে একজন উট চালক অভিযোগ এনেছে।

সামান্য উট চালক সে নয়। জনগণের তখন ছিল পূর্ণ আত্মবিশ্বাস। সত্য ও আত্মপ্রত্যয়ে প্রদীপ্ত ছিল তাদের জীবন। জনগণের এই চেতনা ছিল জাগ্রত। আর খলীফাগণ যে জনগণের সেবক মাত্র সে সম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন ছিলেন। জনগণের দাবীর কাছে, বলিষ্ঠ জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে খলীফারাও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। খলীফার কাছে কাজীর সমন গেল। কাজীর দরবারে তাঁকে হাজির হতে হবে। খলীফা আল-মানসুর সঙ্গীদের বললেন, "আমাকে আদালত ডেকেছে, সে জন্য আমাকে একাই যেতে হবে। সেখানে আমি একজন সাধারণ আসামী মাত্র।" ঠিক সময়ে খলীফা হাজির হলেন কাজীর সম্মুখে। কাজী তাঁর আসন থেকে উঠলেন না। যেমন কাজ করছিলেন তেমনি কাজ করে চললেন। বিচার হলো। কাজী খলীফার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। রায় প্রকাশিত হবা মাত্র খলীফা হর্ষধ্বনি করে বলে উঠলেন, "আল্লাহকে শত ধন্যবাদ আপনার এ বিচারের জন্য। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। আমি সামান্য দশ হাজার দিরহাম আপনাকে পুরস্কার দেবার জন্য আদেশ দিলাম।"

আপনি এই সামান্য কয়েক তাল মাটি তুলতে পারলেন না'

স্পেনে তখন হাকামের রাজত্ব। একদিন রাজধানীর নিকটবর্তী একটি স্থান তাঁকে আকৃষ্ট করলো। সেখানে তাঁর জন্য একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা তিনি ঠিক করে ফেললেন। স্থানটি ছিল এক বৃদ্ধার। বৃদ্ধা সেই স্থানের উপর একটি কুটিরে বাস করতেন। হাকাম স্থানটি উচিত মূল্যে খরিদ করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা রাজী হলেন না। তিনি দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন, তবুও বৃদ্ধা সম্মত হলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে হাকাম জোর করে স্থানটি বৃদ্ধার নিকট থেকে কেড়ে নিলেন। অল্প কালের মধ্যেই সে স্থানে বিরাট সুন্দর প্রাসাদ নির্মিত হলো, সম্মুখে তার একটি সুন্দর উদ্যান। বৃদ্ধা কিন্তু নিরুৎসাহিত হলেন না। তিনি সোজা কাজীর কাছে হাকামের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন।

কিছুকাল পর হাকাম কাজী সাহেবকে দাওয়াত করলেন তাঁর নতুন প্রাসাদ ও বাগান দেখতে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজী একটি গাধা ও কয়েকটি শূন্য থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ একটু বিস্মিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতুকও বোধ করলেন। কাজী বাদশাহর কাছে বিনীত নিবেদন জানিয়ে বললেন, "জাঁহাপনা, আমাকে এই বাগান থেকে কয়েক বস্তা মাটি দিতে হুকুম করুন।" এই অদ্ভুত অনুরোধে বাদশাহ তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। কিন্তু মাটি দিয়ে কাজী কি করবেন, তিনি তা আর ভেবে পাননা। কাজী বস্তাগুলো মাটি দিয়ে ভর্তি করলেন, তারপর বাদশাহকে আরও বিস্মিত করে তিনি বস্তাগুলো গাধার পিঠে তুলে দিতে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ

করলেন। বাদশাহর কৌতূহল চরমে উঠলো। তিনি তাতেও রাজী হয়ে সানন্দে বস্তাগুলো তুলে দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বস্তাগুলো এত ভারী ছিল যে, বাদশাহ্ শত চেষ্টা করে তার একটিও নড়াতে পারলেন না।

কাজী বাদশাহর দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, "আপনি এই সামান্য কয়েক তাল মাটি তুলতে পারলেন না। কিন্তু মহা বিচারের দিন আপনি কি করে গোটা বাগানটাই কাঁধে করে আল্লাহর আদেশে বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দেবেন? কারণ, স্থানটি আপনি বৃদ্ধার নিকট থেকে অন্যায়ভাবে দখল করেছেন।" বাদশাহ্ লজ্জিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি বাগান ও প্রাসাদ সমেত স্থানটি বৃদ্ধাকে দিয়ে দিলেন। শাসনের কর্তৃত্বভার, বড় গুরুদায়িত্ব সে। তার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য জবাবদিহি করতে হবে মহাবিচারের দিন। আল্লাহর কাছে তার হিসেব নিকেশ দিতে হবে। তাই খলীফাদের, মুসলিম বাদশাহর চিন্তার শেষ নেই, ব্যাকুলতার সীমা নেই। আবার কেউ হয়তো আত্মবিস্মৃত হয়ে ক্ষণিকের জন্য কর্তব্যের কথা ভুলে যান, তখন রূঢ় আঘাত দিয়ে, কৌশল ও তৎপরতার সংগে তার সম্বিত ফিরিয়ে আনতে হয়। খলীফা মানুষ তো। ভুল তাই হতে পারে, কিন্তু ভুলের জন্য ভুগতে হয় জনগণকে, দুর্বলকে। তাই দেশের উজীর, দেশের কাজী, খলীফার প্রতিটি কার্যে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন, নির্মমভাবে আঘাত দিতে, অপ্রিয় ও রূঢ় সত্যকথা বলতে একটুও ইতস্ততঃ বোধ করেন না।

আটলান্টিকের তীরে সেনাপতি উকবা

আটলান্টিক আর ভূমধ্য সাগরের নীল পানি বিধৌত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা'। রোমানদের অত্যাচারে জর্জরিত দেশ। সীমাহীন শোষণ আর অমানুষিক অত্যাচারে কাতরাচ্ছে সে দেশের বনি আদম। আর্তনাদ উঠছে আকাশে বাতাশেঃ মুক্তি চাই, এ অত্যাচার থেকে মুক্তি চাই। কিন্তু বাঁচাবে কে? কে এগিয়ে আসবে বলদর্পি রোমানদের শক্তিশালী হাতের মুঠো থেকে তাদের বাঁচাতে? উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার মানুষ সব শেষে অসহ্য হয়ে দামেশকে খলীফার দরবারে পাঠাল আকুল আবেদনঃ অত্যাচার অসত্যের হাত থেকে বাঁচান আমাদের। খলীফার নির্দেশে সিপাহসালার উকবা ছুটে চললেন ক্রমাগত পশ্চিমে। উকবার গতি রোধ করবে কে? সত্যের সৈনিক উকবা থামতে পারেন না। তিনি খুঁজে ফিরছেন আরও কে কোথায় নিপীড়িত হচ্ছে, অসত্য কোথায় এখনও অন্ধকারের সৃষ্টি করছে, আরও সামনে কতদেশ আছে-কত প্রান্তর আছে। উকবার অগ্রগতি সমানে চলছে। ক্লান্তি নেই। বিশ্রাম নেই। এগিয়ে চলেছেন তিনি তাঁর জানবাজ মুজাহিদদের নিয়ে। তাঁর প্রার্থনাঃ 'আল্লাহ' আপনি বলুন আর কত দেশ আছে, এখনও কোথায় সত্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়নি, বলুন, এ উন্মুক্ত অসি আর কোষবদ্ধ করবো না।'

কিন্তু উকবার গতি রুদ্ধ হলো। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে অশ্বের বল্গা টেনে তিনি চেয়ে দেখছেন, অসীম সমুদ্রের বারি রাশি উন্মাদ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। উকবা বিদ্রোহী, সিন্ধুও বিদ্রোহী। দুই দোসর একে অন্যকে দেখে ক্ষণিকের জন্য থমকে

দাঁড়ালো। অশ্রান্ত বিরামহীন গতি সমুদ্রের। উকবার গতিও অপ্রতিহত। অশ্বের বলগা ছেড়ে দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে তিনি সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তরঙ্গের বাহু মেলে সিন্ধু তার বিদেশী বন্ধুকে আলিংগন করলো। দু'হাত তুলে উকবা বললেন, "আল্লাহ" আজ যদি এই অনন্ত সমুদ্র পথের অন্তরায় না হতো তবে আরও দেশ, আরও রাজ্য জয় করে আপনার নামের মহিমা প্রচার করতাম, সত্যের মহিমা প্রচার করতাম, সত্যের বাণী ছড়িয়ে দিতাম, অসত্যকে নিশ্চিহ্ন করে সত্যের আলো জ্বালিয়ে দিতাম।"

আরমেনিয়া প্রান্তরে আল্‌প আর সালান

১০৬৩ সন। সুলতান আলপ আরসালানের হাত থেকে আরমেনিয়া কেড়ে নেবার জন্য কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট রোমানাস ছুটে এলেন। ফ্রান্স, ম্যাসিডনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সেনাদলও তাঁর সাহায্যে ছুটে এসেছে। সুলতান আরসালান ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে ছুটে গেলেন সম্রাট রোমানাসকে বাধা দিতে। সুলতান আরসালান শান্তির প্রস্তাব দিলেন রোমানাসকে। সমুদ্র তরঙ্গমালার মত বিশাল বিক্ষুব্ধ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক রোমানাস শান্তির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে সুলতান আরসালান রোমানাসের মুকাবিলার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা সন্নিবেশ করলেন। কিন্ত তাঁর কত মুসলিম ভাই যে এ যুদ্ধে প্রাণ দেবে, সেটা চিন্তা করে সুলতান আরসালানের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি উচ্চস্বরে গম্ভীর কন্ঠে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, "যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যদি কেউ চলে যেতে চাও, যেতে পার। কাউকেই আমি জোর করে যুদ্ধে যোগদান করতে প্ররোচিত করব না।"

কিন্তু যে সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের জন্য এত দরদ পোষণ করেন সে সেনাপতিকে তাঁর সৈন্যরা মৃত্যুর মুখে ছেড়ে যেতে পারে না। সুলতান আরসালানের ক্ষেত্রেও তাই হলো। সকলেই এক বাক্যে সুলতানের অনুগামী হতে চাইলো।

সুলতান গোসল করে শুভ্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে সৈন্য পরিচালনার জন্যে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। সংগীদের তিনি বললেন, "যুদ্ধ ক্ষেত্রের যেখানে আমার মৃত্যু হবে, সেখানেই আমাকে যেন কবর দেয়া হয়।" বস্তুতঃ শাহাদাতের দুর্লভ পিয়ালা

পানের আশায় যুদ্ধে যাচ্ছেন সুলতান আরসালান। তাঁর প্রতিটি সৈন্যও এই মন্ত্রে দীক্ষিত।

যুদ্ধ শুরু হলো আরমেনিয়ার প্রান্তরে। রক্তের প্রবাহ ছুটছে যুদ্ধের গোটা ময়দানে। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী অকুতোভয়ে মুকাবিলা করে যাচ্ছে বিশাল-বিপুল শত্রু বাহিনীকে। এক সারি শহীদ হয়ে ঢলে পড়ছে মাটিতে, সংগে সংগে পেছনের সারি সামনে এগিয়ে সে স্থান পূরণ করছে। শত্রু নিধন করে শাহাদাতের পিয়ালা পানের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে তারা। দুঃখ নেই, কাতরোক্তি নেই। অশ্বের গতিবেগের সংগে সংগে তাদের জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা উঠছে আর পড়ছে। অবশেষে বদর, খন্দক, ইয়ারমুক, আজনাদাইনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো। দিনান্তে মাগরিবের সময় সমাবেশের শুভ মূহূর্তে আল্লাহর অফুরন্ত দয়ার আকারে বিজয় নেমে এল। জয়ী হলেন সুলতান আর সালান।

যুদ্ধ শেষে বন্দী রোমানাসকে সুলতান আরসালানের সামনে নিয়ে আসা হলো। সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার জায়গায় আপনি হলে আমার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করতেন?' রোমানাস বললেন, 'নির্মম বেত্রাঘাতে আপনার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দিতাম।' সুলতান হাসলেন। বললেন, 'আপনার বাইবেল বলে- শত্রুকে ক্ষমা করো। আমি আপনার সে বাইবেলের উপদেশ অনুসারেই আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। যান আপনি মুক্ত।'

জেরুসালেম নগরী। ১০৯৯ খৃষ্টাব্দ। ১৫ই জুলাই। বিকেল ৩টা। খৃষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে মুসলিম নগরী জেরুসালেমের পতন ঘটল। খৃষ্টান বাহিনী বন্যা স্রোতের মত প্রবেশ করলো নগরীতে। খৃষ্টান অধিনায়ক গডফ্রের নির্দেশে নরবলির মাধ্যমে বিজয়োৎসবের ব্যবস্থা করা হল। নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মুসলিম ও ইহুদী নাগরিকদের নিধন যজ্ঞ চললো তিন দিন ধরে। বীভৎস সে দৃশ্য। কারো মাথা ছিঁড়ে ফেলা হলো, কারো হাত-পা কাটা হলো, কাকেও তীর বৃষ্টি করে মারা হলো, কাউকে মারা হলো পুড়িয়ে। অনেক মুসলমান গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উমার মসজিদে, মসজিদের ভেতরেই তাদেরকে হত্যা করা হলো। ৩০০ মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আল আকসা মসজিদের ছাদে, তাদেরকেও রেহাই দেয়া হলো না। হত্যা করা হলো প্রত্যেককে। রাজপথ দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল সে রক্তে। তিনদিনের হত্যাকান্ডে জেরুসালেম নগরীতে ৭০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হলো।

সেই সেরুসালেমে আর এক দৃশ্যঃ

১১৮৭ খৃষ্টাব্দ। ২রা অক্টোবর। ৮৮ বছর পর মুসলিম বাহিনী গাজী সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে বিজয়ী বেশে জেরুসালেম নগরীতে প্রবেশ করলো। নগরীর আতংকউদ্বেগ পীড়িত খৃষ্টান নাগরিকদের চোখে-মুখে মৃত্যুর ছাপ। কিন্তু শান্ত সুশৃংখলভাবে মুসলিম বাহিনী নগরে প্রবেশ করলো। সকলের আগে চলছেন গাজী সালাহউদ্দীন।

মুখ তাঁর প্রশান্ত, চোখে কোন উত্তাপ নেই। ৮৮ বছর আগে যারা জেরুসালেমকে কসাই খানায় পরিণত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণাও তাঁর চোখে মুখে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিজয়ের পর ক্রুসেডারদের মুক্তিদেয়ার ব্যাপারে গাজী সালাহউদ্দীন অপরিসীম উদারতার পরিচয় দিলেন। প্রত্যেক পুরুষের জন্য দশ, নারীর জন্য পাঁচ ও শিশুর জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ নির্ধারিত হলেও নামমাত্র মুক্তিপণ গ্রহণ করে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিলেন। পরিশেষে দরিদ্র, বৃদ্ধ ও নারীদের তিনি বিনাপণে মুক্তি দিলেন। সহায়সম্বলহীন নারীদের তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ দানও করলেন।

তাইবেরিয়াসে সালাহউদ্দীন

ক্রুসেডের ৯০ বছর পার হয়ে গেছে। ইউরোপ থেকে তৃতীয় ক্রুসেডারদের নতুন দল এসে ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ওদিকে সুলতান সালাহউদ্দীন খন্ড-বিখন্ড মুসলিম শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তুলছেন।

১১৮২-৮৩ সন। মিসর সহ সমগ্র এশিয়া-মাইনর ও তুর্কী অঞ্চল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সুলতান সালাহউদ্দীনের পতাকাতলে আশ্রয়লাভ করল। অতঃপর এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সুলতান এবার মনোযোগ দিলেন ক্রুসেডারদের দিকে। সমগ্র ফিলিস্তিন তখনও তাদের করতলগত। ফিলিস্তিনের প্রত্যেকটি শহরে হাজার হাজার মুসলিম বন্দী অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে। প্রায় ৮৪ বছর ধরে বাইতুল মুকাদ্দাসের মিনার শীর্ষ থেকে মুয়াযযিনের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়নি। জেরুসালেমের উমর মসজিদের অভ্যন্তরে খৃষ্টানরা যে হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছিল, তার রক্তের দাগও হয়তো মুছে ফেলা হয়নি তখনও। সুলতান সালাহউদ্দীন অধীর হয়ে উঠেছেন। একদিকে তাঁর এই অধীর চিত্ততা, অন্যদিকে খৃষ্টান ক্রুসেডারদের অত্যাচারও তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। শান্তির সময়েও মুসলিম বণিকদের কাফিলা বার বার লুণ্ঠিত ও মুসলিম বণিকরা নিহত হচ্ছিল তাদের হাতে। ১১৮৬ সনেও খৃষ্টান অধিনায়ক রেজিনাল্ড অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল। ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের। ৯০ বছরের পুরাতন খৃষ্টান ক্রুসেডের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দীন জিহাদ ঘোষণা করলেন। সময়টা ছিল

১১৮৭ সনের মার্চ মাস। জিহাদ ঘোষণার পর সুলতান সালাহউদ্দীন আশতারায় শিবির সন্নিবেশ করলেন। সালাহ উদ্দীনের প্রাথমিক প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনের সীমান্ত শহর তাইবেরিয়াস।

তাইবেরিয়াসের রাজা গেডি লূসিগনানের নেতৃত্বে জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে রিমন্ড, বিলিয়ান প্রমুখ বিখ্যাত ক্রুসেড অধিনায়করা সালাহ উদ্দীনের মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এল। তাদের অধীনে ১২০০ নাইট সহ অর্ধলক্ষ সৈন্য সমবেত হলো। সুলতান সালাহউদ্দীন ১২ হাজার ঘোড় সওয়ার ও অনুরূপ সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিয়ে তাইবেরিয়াস অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিত্তিনের দু'মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফিলিস্তিনের লুবিয়া গ্রামের সন্নিকটবর্তী প্রান্তরে খৃষ্টান ও মুসলিম সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়াল। সুলতান সালাহ উদ্দীন প্রথম বারের মতো খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হলেন। লুবিয়া প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ক্রুসেডার সেই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে প্রমুখ অধিনায়ক সহ স্বয়ং রাজা ও তাঁর ভাই বন্দী হলেন। যুদ্ধে ৩০ হাজার খৃষ্টান সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। ১১৮৭ সনের জুলাই মাসে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাইবেরিয়াস পুনরুদ্ধার করলেন। প্রথম জিহাদে জয়ী হয়ে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাইবেরিয়াস নগরীতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে আজ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা নেই। কিংবা নেই কোন প্রতিহিংসার আগুণ। ক্রুসেডাররা ১০৯৬ সনে তাদের প্রথম বড় রকমের সাফল্য অর্থাৎ এন্টিয়ক নগরী দখল করার পর যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তা থেকে এ মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধ নয়, বরং জনৈক মুসলিম নামধারী বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এন্টিয়ক নগরী দখল করার পর আত্মসমর্পনকারী দশ হাজার মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে তারা হত্যা করেছিল। আর সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর প্রথম

জিহাদে সাফল্য লাভ করার পর কোন খৃষ্টানের গায়ে আঁচড়ও লাগল না। অগণিত লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ডের নায়ক রেজিনাল্ডকেই শুধু তার দু'শ সাঙ্গ-পাঙ্গসহ প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হলো। আর এন্টিয়ক নগরীতে খৃষ্টানরা যেখানে শহীদ আমীরদের লাশ কবর থেকে তুলে মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে এন্টিয়কের রাস্তায় বন্য নৃত্য করে বেড়িয়েছিল, সেখানে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাইবেরিয়াসের খৃষ্টান রাজাকে হাতে ধরে নিজের কাছে বসিয়ে ঠান্ডা শরবত পান করিয়েছিলেন।

সালাহউদ্দীনের জানাযা

১১৯৩ সন। ২০শে ফেব্রুয়ারী। মক্কা মুয়াজজমা থেকে হাজীরা দেশে ফিরছেন। সুলতান সালাহ উদ্দীন হাজীদের কাফিলাকে আগ বাড়াতে গেলেন। গরম কাপড় না পরে ভিজা আবহাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করে তাঁর জ্বর হলো। জ্বর থেকে আর উঠলেন না তিনি। ১১৯৩ সনের ৪ঠা মার্চ সারা মুসলিম জাহানকে কাঁদিয়ে সুলতান সালাহউদ্দীন ইন্তিকাল করলেন।

ইসলামের সোনালী ইতিহাসের এক অনন্য নায়ক সুলতান সালাহউদ্দীন। ১১৮৭ সনে খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ও বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করার পর দীর্ঘ পাঁচ বছর রণাঙ্গনেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। জেরুসালেম হাতছাড়া হওয়ার সংবাদে গোটা খৃষ্টান ইউরোপ ক্রোধে ফুলে উঠেছিল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ থেকে ১১৮৯ সনে ছয় লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য ছুটে এসেছিল ফিলিস্তিনে। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল গোটা ইউরোপবাসীর আয়ের এক-দশমাংশ। দীর্ঘ তিন বছর, ধরে সুলতান সালাহউদ্দীন যুদ্ধ করলেন উম্মত্ত ক্রুসেডারদের সাথে। কিন্তু সমগ্র ইউরোপের সমবেত শক্তিও সালাহউদ্দীনের সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। ব্যর্থ হলো তাদের তৃতীয় ক্রুসেডও। প্রায় ৪ লক্ষ থেকে ৫লক্ষ ইউরোপীয়কে ভূমধ্যসাগরের বালুবেলায় চিরতরে শুইয়ে রেখে ক্রুসেডাররা ফিরে গেল দেশে। ফিলিস্তিনসহ গোটা নিকট প্রাচ্যের একচছত্র অধিপতি হয়ে থাকলেন সুলতান সালাহউদ্দীন। সুলতান সালাহ উদ্দীন সমগ্র

ইউরোপে কি অপরিসীম ভীতির সৃষ্টি করেছিলেন, সালাহ্ উদ্দীনকে পরাভূত করার জন্য গোটা ইউরোপ থেকে তোলা 'সালাহউদ্দীন কর'ই তার প্রমাণ। ইউরোপের ভীতি ও এক বিশাল রাজ্যের একচছত্র অধিনায়ক সেই সুলতান সালাহউদ্দীন ইন্তিকাল করলেন। আল্লাহর পথে জিহাদের আত্মোৎসর্গিত এই সুলতান যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন কপর্দকহীন ছিলেন তিনি। তিনি ইউরোপত্রাস প্রবল প্রতাপশালী সুলতান ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন সিংহাসন ছিলনা, ছিল না বিলাস ব্যসনের কোন রাজ প্রাসাদ। রাজ্যের সাধারণ রাজকোষ ছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোন তহবিলের অস্তিত্ব ছিল না। নিজের জীবন, সম্পদ সব কিছুকেই তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন জিহাদে। তিনি যদি চাইতেন, যে শক্তি তাঁর ছিল তা দিয়ে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের বিজয়, নিজের জন্য কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়। এ পথেই তিনি তাঁর সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন। তাঁর যেদিন মৃত্যু হলো, সে দিন জানাযার খরচ সংকুলানের অর্থও তাঁর কাছে পাওয়া যায়নি। ধার করা অর্থে তাঁর জানাযার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল।

'ফাঁসিই দিন আর যাই করুন যা সত্য তা বলবই'

সুলতান আলাউদ্দিন খালজী তাঁর প্রধান কাজী (প্রধান বিচারপতি)-কে আহ্বান করলেন দরবারে। কাজী দরবারে এলেন। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, "দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের বিকলাংগ করে শাস্তি দেয়া যায় কিনা।" কাজী রায় দিলেন, "এরূপ শাস্তি ইসলাম বিরুদ্ধ।" এই উত্তরে সুলতান মনক্ষুন্ন হলেন। তিনি আবার জানতে চাইলেন, "দেবগিরি থেকে আমি যে ধনসম্পদ লাভ করেছি, তা আমার না জন সাধারণের প্রাপ্য?" নির্ভীক কাজী উত্তর দিলেন, "ইসলামের সৈন্যবল দিয়ে তা অধিকৃত হয়েছে, সে সম্পদ আপনার হতে পারে না। জনসাধারণের কোষাগারে তা অবিলম্বে জমা দেয়া উচিত।"

সুলতান এবার আর ক্রোধ রাখতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "জনসাধারণের কোষাগারে আমার ও আমার পুত্র-পরিজনদের অধিকার বা অংশ কতটুকু?"

অবিচল কণ্ঠে কাজী উত্তর দিলেন, "একজন সৈনিকের যতটুকু ততটুকু অংশ আপনার ও আপনার পুত্রের প্রাপ্য। আপনার খেয়াল খুশীমত অর্থ যদি আপনি জনসাধারণের কোষাগার থেকে ব্যয় করেন, তাহলে এর জন্য মহা বিচারের দিন আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করতে হবে।"

কাজীর কথায় সুলতান ভীষণ রেগে গেলেন। চরম শাস্তি দেবেন বলে সুলতান তাঁকে শাসালেন।

অকম্পিত কণ্ঠে কাজী বললেন, "ফাঁসিই দিন আর যাই করুন, যা সত্য তা বলবই।" উপস্থিত সকলেই কাজীর ভবিষ্যত ভেবে শংকিত হয়ে পড়ল।

পরদিন কাজী দরবারে হাজির হলেন। সুলতান কাজীকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন দরবারে। বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন। নির্মম হলেও আলাউদ্দিন খালজীর সত্যগ্রহণ করার সাহস ছিল। তাঁর বাহুবলের সাথে এই সত্য-প্রীতি যুক্ত ছিল বলেই তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব সিন্ধু নদ থেকে রামেশ্বরমের সেতু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন বলবনের ন্যায়পরায়ণতা

গিয়াস উদ্দিন বলবনের বিশাল সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমানা- বাদায়ুন প্রদেশ। পাহাড় আর মালভূমির দেশ বাদায়ুন। পাহাড়ের মাঝে মাঝে সুনীল উপত্যকা। পাহাড় থেকে নেমে আসা সফেদ ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে সবুজ উপত্যকার বুক চিরে। এই বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক ফয়েজ। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের পক্ষ থেকে শাসন করছেন তিনি বাদায়ুন। শান্তি ও সমৃদ্ধি তাকে ঠেলে দিল বিলাসিতার দিকে। মদ্যপ হয়ে উঠলেন তিনি। মদ তাঁকে নিয়ে গেল জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতার দিকে। এই ভাবে একদিন তাঁর হাত নিরপরাধ মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠল। মালিক ফয়েজেরই একজন খেদমতগার দাস, একদিন মাতাল অবস্থায় তাকে খুন করলেন মালিক ফয়েজ। বাদায়ুনের অনেক কণ্ঠই প্রতিবাদে সোচ্চার হতে চাইল, কিন্তু মদ্যপের কাছে কোন সুবিচারের আশা নেই জেনে সবাই ধৈর্য ধারণ করল। ঠিক এই সময়েই গিয়াস উদ্দিন বলবন এলেন বাদায়ুনে। সাড়ম্বর সম্বর্ধনার আয়োজন করে মালিক ফয়েজ আগু বাড়িয়ে নিয়ে এলেন সুলতানকে। গিয়াস উদ্দিন বলবন তাঁর প্রিয় শাসনকর্তার কুশলবার্তা জেনে এবং তাঁকে খুশহাল দেখে খুবই খুশী হলেন। পরদিন আম দরবারে বসলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। নাগরিকদের সাথে তিনি দেখা করবেন, তাদের কথা বার্তা শুনবেন। দরবারের এক পর্যায়ে এক বোরখাবৃতা মহিলা এসে সুলতানের সামনে দাঁড়াল। সে অভিযোগ করল, "তার নির্দোষ স্বামীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন শাসনকর্তা মালিক ফয়েজ।" মহিলাটির অভিযোগ শেষ হলে গিয়াসউদ্দিন বলবন মুহূর্তকাল চুপ করে

থাকলেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন পাশেই বসা মালিক ফয়েজের দিকে। মুখে সুলতানের কথা নেই। কিন্তু চোখে তাঁর একরাশ প্রশ্ন। সে দৃষ্টির সামনে মালিক ফয়েজ বসে থাকতে পারলেন না। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। সুলতানের অন্তর্ভেদী চোখের একরাশ প্রশ্নের কোন জবাব মালিক ফয়েজের মুখে জোগালোনা। কিন্তু তাঁর চোখে মুখেই ফুটে উঠল পাপের কালিমা রেখা। সুলতান মুখ ঘোরালেন এবার ফরিয়াদী মহিলাটির দিকে। বললেন, "যাও মা, আল্লাহর আইনে কাজীর আদালতেই এর বিচার হবে। আমিই তোমার পক্ষে বাদী হয়ে দাঁড়াব।"

কাজীর আদালতে বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক ফয়েজের বিচার হলো। হলো প্রাণদন্ডাদেশ–কঠিন প্রহারে জর্জরিত করে তাঁকে মেরে ফেলার হুকুম হলো। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে নির্দেশ কার্যকর করালেন। তারপর অত্যাচারী সেই শাসকের মৃতদেহ তিনি টাঙ্গিয়ে রাখলেন শহরের বুলন্দ দরওয়াজায়।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আর একটি বিচার। অযোধ্যার শাসনকর্ত হয়বত খান হত্যা করেছেন তাঁর দাসকে। নিহত দাসের বিধবা স্ত্রী ফরিয়াদ জানালো সুলতানের কাছে। সুলতান শাসনকর্তাকে পাঁচশ বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে নিহত দাসের বিধবা মহিলার দাসত্বে নিয়োজিত করলেন। পরে হাজার টাকার মুক্তিপণ দিয়ে হয়বত খান সেই বিধবা মহিলার কাছ থেকে বহুকষ্টে মুক্তি ভিক্ষা করে নেন।

নামায যুদ্ধ থামিয়ে দিল

আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমে এক পর্বতময় মালভূমি। তদানীন্তন বলখ ও বাদাখশান রাজ্যের সীমান্ত সন্নিহিত একটি স্থান। ভীষণ যুদ্ধ চলছে দুই দলে। বহু যুদ্ধের মত এটিও ভাইয়ে ভাইয়ে মুসলমানে মুসলমানে আত্মঘাতী এক লড়াই। যুদ্ধমান দু'পক্ষের এক পক্ষে রয়েছে মোগল বাহিনী, অন্যপক্ষে রয়েছে বলখের সুলতান আযীয খানের সৈন্যদল। মোগল বাহিনীকে পাঠিয়েছেন দিল্লীর সম্রাট শাহাজান তাঁর পিতৃভূমি বলখ–বুখারা–বাদাখশান পুনরুদ্ধার করতে। অপর পক্ষে বলখের সূলতান রক্ষা করতে এসেছেন তাঁর রাজ্য। উভয় পক্ষেই কাজ করছে ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠি স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ চিন্তার কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

মোগল বাহিনীর পরিচালনা করছেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। আর বলখের সুলতান স্বয়ং তাঁর বাহিনী পরিচালনা করছেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

ভীষণ যুদ্ধ চলছে। ধীরে ধীরে সূর্য তার আকাশ পরিক্রমায় উঠে এল মধ্য গগনে। মধ্য গগন থেকে সূর্য একটু হেলে পড়ল পশ্চিমে। সেনাপতি শাহজাদা আওরঙ্গজেব মাথা তুলে একবার সূর্যের দিকে চাইলেন। তাঁর চেহারায় পরিবর্তন ঘটল। তিনি হাতের বর্শা ছুড়ে দিলেন মাটিতে। ঘোড়া থেকে নামলেন। কমরবন্ধ খুলে রেখে দিলেন মাটিতে। তার পর জায়নামায বিছিয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে নামায শুরু করলেন। যুদ্ধ তখন অবিরাম চলছে। বৃষ্টির মত ছুটে আসছে তীর বর্শা। যোদ্ধাদের হুংকার, আহতের আহাজারি, অশ্বের হ্রেষা রব এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। কোন দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই,

জায়নামাযের উপর চোখ দুটি তাঁর যেন আটকে আছে, অখন্ড মনোযোগে নামায আদায় করছেন শাহজাদা আরঙ্গজেব। শত্রুদের পুরোপুরি দৃষ্টির মধ্যে রয়েছেন তিনি। যে কোন সময় তীর বর্শা ছুটে এসে তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে কিংবা স্বশরীরে শত্রু তাঁর উপর এসে চড়াও হতে পারে। কিন্তু শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সমগ্র চেহারায় এজন্য কোন প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নেই। মনে হচ্ছে তিনি যেন কোন এক বিরল উপত্যকার নীরব নিঝুম পরিবেশে গভীর প্রশান্তিতে নামায আদায় করছেন।

এই অপরূপ অদৃশ্য দৃশ্যে সমাসীন সুলতান আব্দুল আযীয খান দেখতে পেলেন। তাঁর দৃষ্টি যেন আটকে গেল মহাপ্রভুর সামনে বিনীতভাবে দন্ডায়মান শাহজাদা আওরঙ্গজেবের উপর। হৃদয়টি তাঁর মোচড় দিয়ে উঠলো। শিউরে উঠলো তাঁর গোটাদেহ। কার বিরুদ্ধে, কোন মহান ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তিনি। সুলতান আবদুল আযীয খান চীৎকার করে উঠলেন, "যুদ্ধ অসম্ভব---যুদ্ধ থামাও ---থামাও যুদ্ধ।"

যুদ্ধ বন্ধ হলো। ব্যক্তি স্বার্থ পেছনে পড়ে গেল, জয়ী হলো জাতীয় স্বার্থ, ভ্রাতৃ সম্পর্ক। ইসলাম যেন মূর্তিমান রূপ নিয়ে এসে দু'ভায়ের রক্তপাত বন্ধ করলো। প্রমাণ হলো একমাত্র ইসলামই ভাইয়ে ভাইয়ে আপোষ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে পারে।

১৩৮০ সন। তাইমুর লংয়ের দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনী ধ্বংসের বিষান বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনে। তুর্কী সুলতান বায়েজিদ সে তাতার বাহিনীর ঘূর্ণিঝড়কে সিংহ বিক্রমে বাধা দান করলেন। তুরস্কের রণক্ষেত্রে রক্তের নদী বইল। কিন্তু সুলতান অবশেষে পরাজয় বরণ করলেন। অনেক তুর্কী সৈন্য ও সেনানায়ক বন্দী হল। নিষ্ঠুর তাইমুর তাদের নির্বিচারে প্রাণদন্ড দিতে লাগলেন। একজন তরুন সেনানী রুখে দাঁড়াল এই অবিচারের বিরুদ্ধে। সে তাইমুরের সাক্ষাত প্রার্থনা করল। শিকলে বেঁধে সে বন্দীকে তাইমুর সমীপে আনা হল। বিশ্বজয়ী তাইমুরের সামনে গর্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে সে তরুন সৈনিক বলল, '"সম্রাট তাইমুর, আপনি অন্যায়ভাবে সুলতান বায়েজিদকে আক্রমণ করে হাজার হাজার আল্লাহর বান্দাকে হত্যা করেছেন, মুসলমান হয়ে আপনি ইসলামের অনুগত সেবকদের হত্যা করছেন। বিশ্ব জয়ের অন্যায় ও গর্বিত দাবির জন্যেই শুধু এসব অন্যায় ও গর্হিত কাজ করছেন। কিন্তু মনে রাখবেন আপনাকেও একদিন সকল রাজার রাজা আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে,তখন এসব কাজের কি জওয়াবদিহি আপনি করবেন?"

তরুণ সৈনিকের এ কথা শুনে বিমূঢ় গোটা দরবার। এভাবে পৃথিবীর কেউ যে তাইমুরের সামনে কথা বলতে পারে, আল্লাহর রাজ্যে যে এমন লোকও আছে, দরবার আজই যেন তা বুঝল, বুঝে সন্ত্রস্ত হলো। ভাবল তারা, না জানি এই তরুণের ভাগ্যে কি উৎপীড়ণ আছে।

তরুণ বন্দী মুহূর্তের জন্য একটু থেমেছিল। তারপর মন্ত্রমুগ্ধ দরবারের সামনে এক ঝটকায় মাথার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল। একরাশ সুন্দর কেশগুচ্ছ প্রকাশ হয়ে পড়ল–সুন্দর মসৃন একরাশ নারীকেশ। বিশ্ব জয়ী তাইমুরও এবার বিস্মিত। বন্দিনী আবার বলতে লাগল, "চেয়ে দেখুন, আমি একজন অন্তঃপুরবাসিনী নারী। তবু অন্যায়–অবিচারের প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র হাতে ধরতে হয়েছে, রক্তের নদীতে সাঁতার কাটতে হয়েছে। আপনি আপাততঃ জয়ী হয়েছেন, কিন্তু মনে রাখবেন, যে জাতি এ ধরনের মানসিকতায় উজজীবিত, তাকে পদানত রাখা যায় না, ধ্বংস করা যায় না।"

বিশ্বজয়ী তাইমুরের শির নুইয়ে পড়ল। তিনি মুক্তি দিলেন বায়েজিদ তনয়া হামিদা বানুকে। হামিদা বানুর অনলবর্ষী উক্তি এবং তাঁর সাথে তাইমুরের পরিচয় তাইমুরের জীবনে আনল অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ধ্বংসের হাত তাঁর জাতি গড়ার কাজে ব্রতী হলো।

উরুজ বার্বারোসার বীরত্ব

১৫১৭ সাল। স্পেনে মুসলমানদের শেষ আশ্রয়স্থল গ্রানাডার পতনের (১৪৯২) ২৫ বছর পরের ঘটনা। গোটা স্পেন খৃষ্টানদের পদানত। সম্রাট পঞ্চম চার্লস এবং তাঁর পুত্র ফিলিপের লোমহর্ষক অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ধর্মান্তরিত অথবা স্পেন থেকে বিতাড়িত। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম শক্তিও বিধবস্ত। সেখানেও চলছে স্পেন রাজের হুকুম। আলজিয়ার্স সহ উপকূলীয় মুসলিম বন্দরগুলোতে মেরামতের অভাবে মুসলিম রণপোতগুলো পচে-খসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্পেনের বিতাড়িত মুর মুসলমানরা বাঁচার প্রাণান্তকর সংগ্রামে রত। ভূমধ্য সাগরের যাযাবর সেনাপতি উরুজ বারবারোসা তাদেরই একজন। ঐতিহাসিক 'মরগান' তাঁকে অভিহিত করেছেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে। খৃষ্টান ইউরোপ তাঁকে বলেছে ভূমধ্য সাগরের বোম্বেটে জলদস্যু। আর ঐতিহাসিক 'লেনপুল' বলছেন, "আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতির পৈশাচিক হত্যালীলার প্রতিশোধ নেবার জন্য খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি এক পবিত্র যুদ্ধে রত।"

সেই ১৫১৭ সাল। উরুজ বারবারোসা তখন আলজিরিয়ার তিলিসমানে অবস্থান করছেন। সাথে মাত্র ১৫০০ তুর্কী ও মূর সৈন্য। পার্শ্ববর্তী ওরানের খৃষ্টান শাসনকর্তা মার্কোয়েস ডি কোমারেসের আকুল আবেদনে স্পেন সম্রাট পঞ্চম চার্লসের প্রেরিত ১০,০০০ সৈন্য উরুজের বিরুদ্ধে ছুটে আসছে। চেষ্টা করেও সাহায্যের কোন উৎস তিনি কোথাও থেকে বের করতে পারলেন না। সামনে রয়েছে ডি কোমারেসের বিরাট বাহিনী। অগ্রসর হওয়া যায়না। সুতরাং পিছু

হটে আলজিয়ার্স ফেরাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন উরুজ। শত্রুপক্ষের চোখ এড়াবার জন্য একদিন রাত্রিযোগে তিনি আলজিয়ার্স যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কোমারেসের নেতৃত্বে সম্মিলিত শত্রু বাহিনী ছুটে এল। উরুজের চলার পথে সামনেই রয়েছে এক নদী। উরুজ নিশ্চিত, একবার নদী পার হতে পারলেই শত্রুপক্ষ আর তাঁদের নাগাল পাবে না। লোভী স্পেনীয়দের যাতে বিলম্ব হয় সেজন্য উরুজ তাঁর স্বর্ণ ও অর্থ–সম্পদ রাস্তাময় ছড়িয়ে আসতে লাগলেন। কিন্তু খৃষ্টান বাহিনী এবার দুর্জয়, অপ্রতিরোধ্য উরুজকে হাতে পাবার নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে। তারা মণিমানিক্য পদদলিত করে ছুটে এল উরুজের পেছনে।

উরুজ তাঁর অর্ধেক সৈন্য সহ নদী পার হয়েছেন। ইতোমধ্যে খৃষ্টান বাহিনী এসে পড়ল নদীর তীরে। নদীর ওপারে উরুজের অবশিষ্ট সৈন্য আক্রান্ত হলো। উরুজ ফিরে দাঁড়ালেন। নদীর এপার থেকে নদীর ওপারে নিজ সাথীদের আক্রান্ত হবার দৃশ্য দেখলেন। ইচ্ছা করলে উরুজ তাঁর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে নিরাপদে আলজিয়ার্স ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি এপারের সাথীদের বললেন, "আমার একটি মুসলিম ভাইকেও খৃষ্টানদের হাতে রেখে আমি ফিরে যেতে পারি না।" বলে আবার তিনি লাফিয়ে পড়লেন নদীতে। তাঁকে অনুসরণ করল তাঁর প্রতিটি সৈনিকই। ওপারে উঠে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী সংগঠিত করে শত্রুসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উরুজের প্রতিটি সৈনিক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রু হনন করে শাহাদাত বরণ করলেন। ইতিহাস বলেঃ একটি মুসলিম সৈনিকও সেদিন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়নি। সিংহের মত যুদ্ধ করে উরুজ তাঁর পনরশ' সাথী সমেত যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করলেন। একটি যুদ্ধে একটি গোটা বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে আর নেই।

দান কমাতে গিয়ে বাড়ল

বাংলাদেশে তখন সুলতানী শাসন। সুলতান ফিরোজ শাহ বাংলার সিংহাসনে। হযরত বিলালের দেশ আবিসিনিয়ার অধিবাসী তিনি। কৃষ্ণাংগ ফিরোজ শাহ সামান্য অবস্থা থেকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠেও দৃষ্টি তার উর্ধমুখী হলো না, নীচের দিকে জনসাধারণের দিকেই নিবদ্ধ থাকলো। ভুললেন না তিনি জনসাধারণের কথা–গরীবদের কথা। তিনি অকাতরে রাজকোষ থেকে গরীব জনগণকে অর্থ দান করতে লাগলেন। অভাবীর সংখ্যা বিপুল, প্রয়োজন তাদের বিরাট। তাই রাজকোষ থেকে অর্থ খরচ হতেও লাগল পানির মতো। রাজ দরবারের আমীর–উমরারা মহাবিপদে পড়ল–প্রমাদ গুণল তারা। ভাবল সুলতানের এ কী অমিতাচার! এভাবে দান করতে থাকলে তো রাজকোষ শূণ্য হয়ে যাবে। আমীর উমরারা চিন্তা করলো, সুলতান নিজের হাতে অর্থ সাহায্য দেন না, তাই হয়তো অর্থের মায়া তাঁর কাছে বড় হয় না। দিনে যে অর্থ দান করা হয় তা যদি তিনি এক সংগে দেখতে পেতেন, তাহলে এত অর্থ কিছুতেই তিনি দিতে রাজী হতেন না। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি এত বড় হয়েছেন, অর্থের মর্যাদা তাঁর চেয়ে আর বেশী কে বুঝবে। সুতরাং মন্ত্রণা পরিষদ পরামর্শ করে ঠিক করল, দানের অর্থ এনে সুলতানের সামনে হাজির করতে হবে। পরামর্শ অনুসারেই কাজ হলো। পরদিন দানের জন্য নির্দিষ্ট একলক্ষ কাঁচা রৌপ্য মুদ্রা এনে স্তূপীকৃত করে

একজন মন্ত্রী অতি বিনয় সহকারে বললেন, "এ টাকাগুলোই আজ গরীব ও সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য দিয়েছিলেন।" সুলতান ফিরোজ শাহ্ সে টাকার দিকে চেয়ে বললেন, "ও আচ্ছা, এ টাকাও তো যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। এর সাথে আরও এক লক্ষ টাকা যোগ করে গরীব দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দাও।" হতবাক মন্ত্রী আর কিছু বলতে পারলো না, বলতে সাহস পেলোনা। সুলতানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। সেদিন দান করা হলো দু'লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা।

ইতিহাসে ব্যক্তিগত ও বংশীয় রাজসিংহাসনে খোদাভীরু শাসকের আগমনে মাঝে মধ্যে এভাবে রাজকোষ জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।